

Vol. 36 | No. 3 | 1993

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

দোহাকোষ-গীতি [সরহপা]

Volume	36
Issue	3
Year	1993
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আলী আহসান
Published online	June 1, 1993
DOI	10.62328/sp.v36i3.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i3.1
Pages	1-54
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

দোহাকোষ–গীতি
[সরহপা]
সৈয়দ আলী আহসান

ভূমিকা

খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে সরহপা বিদ্যমান ছিলেন। চর্যাগীতিকা সূত্রে এবং দোহাকোষের ভাবানুষঙ্গে আমরা সরহপাকে একজন সন্ত-সিদ্ধ এবং মহান পণ্ডিত এবং কবি হিসেবে গণ্য করে থাকি।[১] পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন সরহপার সময়কালের রাজনৈতিক স্থিতি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। পণ্ডিত রাহুলের আলোচনা অনুসরণ করে আমি এখানে সে-সময়কার রাজনৈতিক পৃষ্ঠভূমির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি।[২] পুষ্পভূতি অথবা বর্ধন বংশের রাজা হর্ষবর্ধন প্রাচীন ভারতের একজন দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন। তিনি ৪২ বছর পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তার রাজ্যকাল ছিল ৬০৬ থেকে ৬৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর এই সুদীর্ঘ রাজ্যকাল শান্ত এবং সমৃদ্ধ শাসনের নিদর্শন ছিল। ৬৪৮ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন নিহত হন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। হর্ষবর্ধনের নিহত হওয়ার পর চীনের রাজদূত তিব্বতী এবং নেপালী সেনা সংগ্রহ করে হর্ষবর্ধনের রাজধানীতে যে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেই অর্জুনকে পরাজিত করেন এবং তাঁকে বন্দী করে চীন দেশে নিয়ে যান। একশ বছর পর্যন্ত কান্যকুব্জ সাম্রাজ্যে বিভিন্ন রাজন্যবর্গের মধ্যে পারস্পরিক কলহ চলেছিল এই ইতিহাস আমাদের পুরোপুরি জানা নেই। এক শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমরা ভারতবর্ষে তিনটি মহাশক্তির উদয় দেখি: ১. পূর্বে যশস্বী পালবংশ হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় ভূভাগে আপন শাসন স্থাপন করেছিল; ২.দক্ষিণাপথে রাষ্ট্রকূট শাসন প্রচলিত ছিল এবং ৩. রাজপুতানায় গুর্জর-প্রতিহার রাজবংশীয়রা যমুনা এবং গঙ্গার প্রান্তদেশ পর্যন্ত রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করেছিল। এই

তিনটি শক্তি ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছিল। যখন এই তিনটি শক্তি ভারতে আপন প্রভাব বিস্তারে তৎপর ছিল সে-সময় ভারতের বাইরে একটি বিরাট বিশ্বশক্তি পশ্চিম থেকে এসে ভারতের এক প্রান্ত স্পর্শ করেছিল। এই শক্তি হচ্ছে আরব দেশের ইসলাম। হর্ষবর্ধনের জীবিতকালে ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে প্রবল পরাক্রান্ত আরব সেনা ইরানের প্রতাপী সাসানী রাজবংশের উচ্ছেদ করে। আরব শক্তি তুখারিস্তান[৩] বা মধ্য আমু উপত্যকা পর্যন্ত উপস্থিত হয়। আরবদের বিজয়ের ফলে বিজিত দেশসমূহে একটি নতুন সংস্কৃতির উদ্ভব হতে থাকে। তুখারিস্তান ছিল মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ ধর্মের প্রাণকেন্দ্র। বর্তমানে যেটা বলখ নামে প্রসিদ্ধ সেখানকার বৌদ্ধ বিহারে অনেক বিদ্বানের সমাবেশ ছিল। তথাগতের ভিক্ষাপাত্র বলখের বৌদ্ধ বিহারে রক্ষিত ছিল। যদিও তুখারিস্তানে ইসলামের প্রবেশের ফলে তৎকালীন ভারতবর্ষে কোনো আলোড়ন হবার কথা নয় কিন্তু নালন্দা এবং অন্যান্য বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্রে বলখের ঘটনা নিশ্চয়ই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তুখারিস্তানের বৌদ্ধদের সাহায্যের জন্য ভারতের বৌদ্ধসম্প্রদায় কোনো কিছু করতে পারেনি এবং করা সম্ভবও ছিল না। অষ্টম শতকে ইসলাম এসে উপস্থিত হয় সিন্ধু মহানদের তীর পর্যন্ত। ৭১১ খৃষ্টাব্দে উমাইয়া বংশের খলিফা ওলিদের সেনাপতি মোহাম্মদ বিন কাসিম সিন্ধু জয় করেন এবং ভারতের সিন্ধু দেশ আরব সাম্রাজ্যের বিজিত দেশে পরিণত হয়। অন্যদিকে ওলিদের অন্য এক সেনাপতি কুতুব বিন মুসলিম বক্ষু এবং সিরের অভ্যন্তরস্থ ভূ-ভাগে ইসলামী শাসন স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে বুখারায় ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তুর্কীস্থানেও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মধ্য এশিয়ায় কাশগড় ইসলামের অধীনস্থ হয়েছে। এ সমস্ত অঞ্চলে বৌদ্ধদের এককালে প্রবল প্রতিপত্তি ছিল।

ভারতবর্ষে পাল, রাষ্ট্রকূট এবং প্রতিহার রাজবংশ অষ্টম শতকের শেষে আপন আপন স্থিতি সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছিল। সরহপার সময়কালেই ৭৬৫ খৃষ্টাব্দে গোপাল পাল বংশের স্থাপনা করেন। গোপাল কোনো রাজবংশীয় ছিলেন না, তিনি আপন যোগ্যতা এবং সর্বপ্রিয়তার কারণে পূর্ব ভারতের অধীশ্বর হতে সক্ষম হয়েছিলেন। গোপালের পুত্র ধর্মপাল সাম্রাজ্যের প্রসারের চেষ্টা করেন এবং সে-কারণে রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহারদের সঙ্গে তার সংঘর্ষ বাধে। গোপাল-ধর্মপালের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। সে-সব বিদ্যাকেন্দ্রে দূর দূর থেকে বিদ্যার্থীরা আসতো আবার এখানকার অনেক বিদ্বান এবং পণ্ডিত ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে যেতেন। এ-সময়ই মহান বিদ্বান শান্তিরক্ষিত বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন।

যে অষ্টম শতকে সরহপার আবির্ভাব সেটা ছিল বৌদ্ধ ধর্মের জন্য একটি সন্ধিকাল। সরহপার এক শতাব্দীপূর্বে তিনজন মহীয়ান বৌদ্ধ পণ্ডিতের পরিচয় আমরা পাই, তাঁরা হচ্ছেন বসুবন্ধু, দীঙ্গনাগ এবং ধর্মকীর্তি।[৪] বলা যেতে পারে হীনযান এবং মহাযান উভয় সাধন-পদ্ধতি এদের সময় বিকাশের চরম সীমায় পৌঁছেছিল। এর পর আমরা মন্ত্রযান, বজ্রযান এবং সহজযানের সন্ধান ক্রমান্বয়ে পেতে থাকি। হীনযান এবং মহাযানের পরে এই সমস্ত নতুন তাৎপর্যবহ সাধনার স্বীকৃতি সরহপার মধ্যে পাই। হীনযান বা স্থবিরবাদ শীল-সদাচারের[৫] উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং এ-সম্প্রদায়ের লোকেরা বুদ্ধের দর্শন এবং শিক্ষাকে যথাশক্তি মৌলিকরূপে রাখতে সচেষ্ট ছিল। মহাযানে আচার এবং নিষ্ঠাগত অনেক পরিবর্তন এলেও তাঁরা মূলত হীনযানের শীল-সদাচার এবং ভিক্ষুচর্যার অনেক নীতি-নিয়ম স্বীকার করে নিয়েছিল। বস্তুত মহাযান সম্প্রদায়ের ভিক্ষুরা হীনযান সম্প্রদায়ের বিনয়-নিয়মকে মান্য করতো। এসমস্ত বিনয়-নিয়মের উল্লেখ বিনয়পিটকে আছে। তবে মহাযানীরা হীনযানীদের ব্যক্তিক নির্বাণকে হীন এবং স্বার্থপূর্ণ আখ্যা দিত এবং ব্যক্তিক মুক্তির স্থানে প্রাণিমাত্রকে দুঃখ থেকে মুক্ত করবার জন্য আপন অনন্ত জন্মকে উৎসর্গ করবার কথা বলতো। বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষণিক এবং অনাত্মবাদী দর্শনকে ক্রমান্বয়ে এরা নাগার্জুনের[৬] মাধ্যমিক বা শূন্যবাদ দর্শনে পরিণত করে এবং অসঙ্গ যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠা ঘটায়। ক্রমান্বয়ে এমন একটি সময় উপস্থিত হয় যখন শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞাসম্বন্ধীয় পুরাতন পরম্পরা এবং ধারণা পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন হয়ে পড়লো। এই পুনর্মূল্যায়নের কাজে যিনি অগ্রসর হলেন তিনি মহাপণ্ডিত সরহপা। সরহপা সহজ জীবনের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ভক্ষ্য-অভক্ষ্য এবং গম্য-অগম্য এই সমস্ত পুরাতন ধারণাকে অস্বীকার করলেন। একর্মে অগ্রসর হতে গিয়ে সরহপাকে জনসাধারণের সহায়তা গ্রহণ করতে হয়েছে অর্থাৎ জনসাধারণের ভাষায় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তিনি তাঁর নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। সরহপা জনসাধারণের ভাষাকে গ্রহণ করে সেই ভাষায়ই তাঁর সমস্ত নিবেদন উপস্থিত করতেন। সরহপা সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন জনসাধারণের ভাষাকে আপন বক্তব্যের মাধ্যম করেছিলেন।

শুধু বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রেই যে আচার-আচরণের সংশোধনের প্রয়োজন হয়েছিল তাই নয়, ব্রাহ্মণ্যবাদের ক্ষেত্রেও পরিশোধনের প্রয়োজন হয়েছিল। উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতে পাশুপত ধর্ম প্রভাবশালী ছিল আবার গুপ্তকালীন বৈষ্ণবধর্ম ক্রমান্বয়ে হ্রাস-উন্মুখ হয়েছিল। দক্ষিণে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদী অদ্বৈত বিজ্ঞানবাদ দর্শন প্রকট হয়েছিল। তিনি অসঙ্গবোধের যোগাচার দর্শনকে নতুন রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। এ কারণেই শঙ্করাচার্যকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়ে থাকে। শঙ্করাচার্যকে বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ-দর্শনের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টিকারী বলা হয়ে থাকে যদিও তিনি

শিব, বিষ্ণু এবং শক্তিকে পরম আরাধ্য জ্ঞান করতেন। যাই হোক, সরহপার সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন ধার্মিক প্রবাহ ভারতবর্ষে প্রকাশ পেতে দেখি। তাঁর সময় থেকে যে সন্ত-পরম্পরা গড়ে উঠেছিলো আজও তা বিদ্যমান আছে।

সরহপা তাঁর 'দোহাকোষ-চর্যাগীতি'র প্রথম বারোটি দোহায় তাঁর সময়কালের ধার্মিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিচারকে খণ্ডন করেছেন। তিনি বলছেন: "যদি নগ্ন হলেই মুক্তি আসে তাহলে কুকুর এবং শৃগালইতো যথার্থ মুক্ত। ময়ূরের পাখা গ্রহণ করলেই যদি মোক্ষ আসে তাহলে ময়ূর এবং চমরইতো মোক্ষ লাভের অধিকারী। শিলা চুম্বন করলেই যদি জ্ঞান লাভ হয় তাহলে তো করী এবং তুরঙ্গ সর্বতোভাবে জ্ঞানী।" সরহপার নিজস্ব ভাষায়:

জই ণগ্গাবিঅ হোই মুক্তি,
তা সুণহ সি অল্লেহ।
লোমুপাড়ণেঁ অস্থি সিদ্ধি,
তা জুবই ণি-অম্বহ।
পিচ্ছীগহণে দিট্ঠ মোক্ষ
তা মোরহ চমরহ।।[৭]

অনেক পরে কবীরের দোহায় একই ভাবের অভিব্যক্তি ঘটেছে–

কা নাঙ্গে কা বাধে চাম
জৌ নহি চীহ্নসি আতম রাম।
নাঙ্গে ফিরে জোগ জে হোঈ
বনকা মৃগ মুকতি গয়া কোঈ
মুণ্ড-মুণ্ডায়ে জৌ সিধি হোঈ
স্বর্গহি ভীড় ন পহুঁচী কোঈ।

সরহপা বলছেন যে যথার্থ সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন সংকল্প ও অসংকল্পের সমন্বয়, করুণাশূন্যতা এবং শুধুই করুণার সতীর্থতা, ধ্যান ও ধ্যানহীনতার একত্রতা। তা হলেই সহজ-স্বভাবের উজ্জীবন ঘটবে। তাঁর ভাষায়:

করুণ-রহিঅ জ্ঞো সুন্নহিঁ লগ্গা।
ণউ সো পাবই উত্তিম মগ্গা।।
অহবা করুণা কেবল সাহঅ।
সো জন্মন্তরে মোক্খ ণ-পাবঅ।।
জই পুণ-বেণ্নবি জোড়ণ সাক্কঅ।
ণ-উ ভব ণউ ণি-কাণে থাক্কঅ।।

সরহপা চিত্তকে সকল অস্তিত্বের বীজস্বরূপ গণনা করেছেন, ভব-নির্বাণ চিত্ত থেকেই বিস্ফুরিত হয়। কর্ম মানুষকে বন্ধন করে, কর্ম-বিমুক্ত হলেই মন মুক্ত হয়। তিনি আরো বলছেন, ইন্দ্রিয় যখন বিলীন হয় তখনই আত্মস্বভাব বিনষ্ট হয় এবং আত্মস্বভাব বিনষ্ট হলেই একজন সাধক সহজানন্দ তনু লাভ করে। যেখানে

মানুষের ইচ্ছার মৃত্যু ঘটে অথবা যখন মানুষের ইচ্ছার মৃত্যু ঘটে তখন অথবা সেখানে সে পরম মহাসুখ লাভ করে। এভাবে সরহপা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জ্ঞানকে প্রকাশ করেছেন।

সরহপার জীবনী সম্পর্কে অতি অল্পই জানা যায়। তবে তিব্বতী ভাষায় তাঁর অনুবাদিত গ্রন্থসূত্রে সরহপা সম্পর্কে যে-সমস্ত আলোচনা আছে সেগুলোকে রাহুল সাংকৃত্যায়ন সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক ভেবেছেন। 'চতুরশীতিসিদ্ধপ্রবৃত্তি'' (স্তন্, গ্যুর, র্গ্যুদ্, ৮৬/১) গ্রন্থে সিদ্ধাগণের জীবনসূচি দেওয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে ভারতীয় ভাষা থেকে তিব্বতী ভাষায় যে-সমস্ত গ্রন্থ অনুবাদিত হয়েছে সে-সমস্ত গ্রন্থের লেখকগণের পরিচয় আছে। এই লেখকগণের সময়কাল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এই সময়কালে তিব্বত এবং ভারতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিব্বতের অনেক জিজ্ঞাসু ভিক্ষু ভারতে এসে দীক্ষা গ্রহণ করতেন। তিব্বতের একজন মহান সিদ্ধ বিক্রমশীলায় তৎকালীন মহাসিদ্ধ নারপার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তিব্বতী সন্তদের গ্রন্থের মধ্যে মৌখিক গুরু-পরম্পরার উল্লেখ আছে।

সরহপা 'পূর্বদিশা' নামক এক অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই পূর্বদিশা স্পষ্টত: কোন অঞ্চল ছিল বোঝা যায় না। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে মগধের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ পূর্বদিশা নামে পরিচিত ছিল; যে অঞ্চলে সম্ভবত বরেন্দ্রভূমিও যুক্ত ছিল। তাতে মনে হয় বঙ্গদেশের বরেন্দ্রভূমি সরহপার জন্মস্থান ছিল। রাহুল সাংকৃত্যায়ন আবার পুণ্ড্রবর্ধনের উল্লেখ করেছেন; বলেছেন সরহপার জন্ম-নগরী সম্ভবত পুণ্ড্রবর্ধন ছিল। এক ব্রাহ্মণ পরিবারে সরহপার জন্ম হয়েছিল বলে আমরা জানি। আরো এক শতাব্দী পূর্বে একই অঞ্চলে বাণ নামক এক বৈভবশালীর বিবরণ আমরা পাই যার সময়ে উক্ত অঞ্চলে কবি, পণ্ডিত, কলাকার, সঙ্গীত-নৃত্যকার ভিক্ষু পরিব্রাজক, বৈদ্য, তান্ত্রিক, ধূর্ত এবং পরিচারক নিয়ে বাণ বসবাস করতেন। সরহপা বাণের মত বৈভবশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কিনা তা জানিনা তবে এটুকু অনুমান করতে পারি যে সপ্তম/অষ্টম শতকে উক্ত অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ সম্ভ্রমগত স্থিতিশীলতায় বাস করতেন। ব্রাহ্মণ স্বাভাবিকভাবেই বিদ্যা চর্চা করবেন এটা আমরা ধারণা করে নিতে পারি। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে উচ্চ-নীচ জাতি ব্যবস্থার মূলে আঘাত এসেছিল যার ফলে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করেও যে কোনো ব্যক্তি সম্মুখবর্তী হবার সাহস রাখতে পারতো। পাল বংশদ্ভূত নৃপতিরা বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁদের প্রধানমন্ত্রী প্রায়শ আবার ব্রাহ্মণকুলের হতেন। একজন পাল মহামন্ত্রীর নির্দেশে নারায়ণ মন্দির নির্মিত হয়েছিল। আমরা ধারণা করে নিতে পারি যে সে সময় বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রভাবের ফলে আস্তিক্যবাদী ব্রাহ্মণদের মনে বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। যাই হোক এটা আমরা বলতে পারি না যে সরহ ব্রাহ্মণধর্মী ছিলেন। যদিও তিব্বতী অনুবাদে যেখানেই সরহপাকে সিদ্ধ বা

যোগীশ্বর বলা হয়েছে সেখানেই তাকে 'মহান ব্রাহ্মণ' উপাধিতে বিভূষিত করা হয়েছে। তিব্বতী ভাষায়-'ব্রম্. সে. ছেন্. পো'। আসলে এই উপাধির দ্বারা এটা প্রমাণ করা কঠিন যে সরহপা ব্রাহ্মণ ধর্মানুসারী ছিলেন। কেননা আমরা দেখি যে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'ধর্মপদ'-এ ব্রাহ্ম গুণের উল্লেখ আছে। তাছাড়া আমরা দেখি যে সরহপা তাঁর দোহাকোষের সূত্রপাতে ব্রাহ্মণ্যবাদকে আঘাত করেছেন। অর্থাৎ তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঠিকই কিন্তু নিজে শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ থাকেন নি।

সরহপার বাল্য, কৈশোর এবং তারুণ্যকাল সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। সরহপার জীবনের বিভিন্ন কৃতি দেখে আমরা অনুমান করতে পারি যে তিনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন এবং অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলেছেন যে সরহপা প্রকৃতিস্থ প্রতিভাবান ছিলেন। দোহাকোষ পাঠ করে বোঝা যায় যে তিনি বেদ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং বেদের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণ, কোষ এবং কাব্য অধ্যয়ন করেছিলেন। সম্ভবত, সম্ভবত কেন নিশ্চয়ই, সে-যুগের প্রভাব অনুসারে সরহপা কোনো বৌদ্ধসংঘে শিক্ষার জন্য প্রবেশ করেছিলেন। সরহপা পরে নালন্দায় ছাত্র হিসেবে প্রবেশ করেছিলেন।

সরহপা নামে প্রখ্যাত হবার পূর্বে তাঁর নাম ছিল রাহুল ভদ্র এবং সরোজ বজ্র।[৮] ভিক্ষু-নাম সম্ভবত রাহুল ভদ্র ছিল। বজ্রযান সাধনার সঙ্গে সম্পর্ক থাকার দরুন সম্ভবত তাকে সরোজ বজ্র বলা হত। সরহপা কোথাও তাঁর নিজের গুরুর নাম উল্লেখ করেননি যদিও গুরু-প্রণাম করেছেন। সুতরাং নালন্দায় তাঁর উপাধ্যায় এবং আচার্য কে ছিলেন তা আমরা ঠিক ঠিক বলতে পারছিনা। সময়ের হিসাব অনুসারে বলা যায় যে তিনি যখন নালন্দায় ছিলেন তখন সেখানে হরিভদ্র নামে একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন। হরিভদ্র শান্তরক্ষিতের শিষ্য ছিলেন। শান্ত রক্ষিত দর্শন এবং প্রমাণ শাস্ত্রে তাঁর সময়কালের মহাপণ্ডিত ছিলেন। শান্তরক্ষিত ভোট সম্রাট খিস্রোডং দে. চন (৭৫৫-৮০ ইং)-এর আমন্ত্রণে তিব্বতে যান এবং সেখানে প্রথম সংঘারাম নির্মাণ করেন (সম্-য়ে)। ৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দে একশত বর্ষ আয়ুষ্কালে শান্তরক্ষিতের মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর সময় তিনি বোধিসত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। সম্ভবত শান্তরক্ষিতের জীবনকালেই রাহুল ভদ্র সরহপা নামে অভিহিত হয়েছিলেন। আমরা বলেছি সরহপা শান্ত রক্ষিতের শিষ্য হরিভদ্রের নিকট অধ্যয়ন করেছিলেন হরিভদ্র রাজা ধর্মপালের সময় জীবিত ছিলেন। ধর্মপালের সময়কাল ৭৭০ থেকে ৮১৫ খৃষ্টাব্দ। সরহপাও ধর্মপালের সমকালীন ছিলেন। আমরা জানি যে সরহপার শিষ্য শবরপা। শবরপার শিষ্য লূঈপা রাজা ধর্মপালের কায়স্থ ছিলেন। কায়স্থ শব্দের অর্থ হচ্ছে সচিব বা লেখক। যখন লূঈ রাজার সঙ্গে বরেন্দ্রভূমিতে অবস্থান করছিলেন তখনই তিনি শবরপার ঘনিষ্ঠ হন এবং রাজার অনুমতি নিয়ে গৃহত্যাগী

হন। এ সময় নিশ্চয়ই সরহপার দেহান্তর ঘটেছিল কেননা তখন সরহপা সিদ্ধ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। লূঈপা অসাধারণ পুরুষ ছিলেন তার প্রমাণ আমরা সিদ্ধাগণের সূচি পাঠ করলেই অনুমান করতে পারি। গুরু পরম্পরায় তাঁর স্থান তৃতীয় হওয়া সত্ত্বেও (সরহ >শবর > লূঈ) সিদ্ধাগণের তালিকায় তিনি ছিলেন প্রথম। রাহুল সাংকৃত্যায়ন সরহপার মৃত্যুকাল ৭৮০ খৃষ্টাব্দ হিসাবে গণনা করেছেন। রাহুল ভদ্র নালন্দা বিদ্যাপীঠে প্রথমে বিদ্যার্থী ছিলেন, পরে অধ্যাপক হয়েছিলেন। সরহপা কবিতা লিখেছিলেন ঠিকই কিন্তু পরে তত্ত্বজিজ্ঞাসায় মনোনিবেশ করেন। অবশ্য তাঁর বিবিধ তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার মধ্যেও কবিত্বের আস্বাদন পাওয়া যায়। সরহপার রচনায় কিছু কিছু সংস্কৃত শ্লোক পাওয়া যায়। শ্লোকগুলি কবিত্ব-মাধুর্যে পরিপূর্ণ। নিম্নে একটি শ্লোকের উদাহরণ দিচ্ছি:

যা সা সংসারচক্র বিরচয়তি মন:সন্নিযোগাত্মহেতো:
সা ধীর্যস্য প্রসাদাদ্ দিশতি নিজভুবং স্বামিনো নিষ্প্রপঞ্চ:।
তচ্চ প্রত্যাত্মবেদ্যং সমুদয়তি সুখং কল্পনাজাল মুক্তং
কুর্যাৎ তস্যাংঘ্রিযুগং শিয়সি সবিনয়ং সদ্‌গুরো: সর্বকালম্।।

রাহুল ভদ্র শাস্ত্রের অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যসমুদ্রেও অবগাহণ করেছিলেন। সরহপার সময় অশ্বঘোষের কাব্য 'বুদ্ধচরিত' এবং 'সৌন্দরনন্দ', অশ্বঘোষের নাটক 'সারিপুত্র প্রকরণ' এবং 'রাষ্ট্রপাল' বিদ্যমান ছিল। আরো ছিল ভাস-এর নাটক, কালিদাসের সকল অমর কৃতি। সুতরাং এটা স্বাভাবিক এই সমস্ত কাব্য এবং নাটক সরহপার মনে প্রভাব বিস্তার করে থাকবে।

রাহুল ভদ্র যখন সরহপা নামে বজ্রযান সম্প্রদায়ের প্রথম সিদ্ধা হিসাবে পরিচিত হলেন তখন থেকেই কিন্তু বজ্রযানের সূত্রপাত নয়। আমরা চৌরাশি সিদ্ধাদের নাম পাই এটা ঠিক কিন্তু চৌরাশি সিদ্ধার পূর্বেও যে কিছু সিদ্ধা ছিলেন তার প্রমাণ পাই 'মৃচ্ছকটিক' নাটক থেকে।[৯] উক্ত নাটকে মন্ত্রসিদ্ধির উল্লেখ আছে। 'মৃচ্ছকটিক' নাটক ষষ্ঠ শতকে রচিত হয়েছিল। 'মৃচ্ছকটিকে' আশ্চর্য বার্তাসহস্র শ্রীপর্বতেরও উল্লেখ আছে। অন্ধ্র প্রদেশের নাগার্জুনীকোণ্ডা নামক বিশাল ধ্বংসাবশেষে আমরা শ্রীপর্বত নামক একটি বৌদ্ধ কেন্দ্রের সন্ধান পাই। এতে বোঝা যায় যে সরহপার পূর্বেও বৌদ্ধ সাধনার ধারা এদেশে বিদ্যমান ছিল।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সরহপা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের আচরণীয় দৃষ্টিগোচর কিছু সংখ্যক অভিলাষ এবং প্রবৃত্তি অস্বীকার করে সহজপন্থা নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছিলেন। ভিক্ষুগণ স্ত্রী-বিরত থাকতেন, মদ্যপান করতেন না, শরীরে চীবর ধারণ অনিবার্য ছিলো। রাহুল ভদ্রের নিকট এ-সমস্ত কিছু অবাস্তব ও অস্বাভাবিক মনে হয়েছিলো। তিনি তখন সাধারণ জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নিলেন এবং একজন তীরধনুক প্রস্তুতকারীর কন্যাকে আপন সহচরী করে নিজেও শরনির্মাণের কর্মে

নিযুক্ত হলেন। এভাবেই 'শর-কার' বা শর নির্মাণকারী হিসেবে তাঁর নাম 'সরহা' হল। ভক্তজনের কাছে শ্রদ্ধার প্রতীক হিসেবে তিনি 'সরহপাদ' হলেন। তিনি সহজ সাধনার সহায়ক হিসেবে শরকার-কন্যাকে তাঁর 'মহামুদ্রা' করলেন। তিনি বললেন যে ধ্যানের সঙ্গে করুণা যুক্ত না হ'লে ধ্যান অর্থহীন হয়। করুণার সাহায্যে তিনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনতে চাইলেন। সংস্কৃত ভাষাকে উপেক্ষা করে তিনি পণ্ডিত সমাজে অস্বীকৃত অপভ্রংশকে আপন ভাবের মাধ্যম করলেন কেননা তাঁর লক্ষ্য ছিলো জনসাধারণের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা।

'স্তন্ গ্যুর্' বা তাঞ্জুরের সংগ্রহে তিব্বতী অনুবাদে সরহপার ষোলটি অপভ্রংশ গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলোর নাম নিম্নে প্রদত্ত হল:

১. দোহাকোষ; ২. দোহাকোষ নাম চর্যাগীতি; ৩. দোহাকোশোপদেশ গীতি ৪. ক. খ. দোহানাম; ৫. ক. খ. দোহাটিপ্পণ; ৬. কায়কোষামৃতবজ্রগীতি; ৭. বাক্যশরুচী; ৮. চিত্তকোষাজবজ্রগীতি; ৯. কায়বাকৃচিত্তামনসিকার; ১০. দোহাকোষ মহামুদ্রোপদেশ; ১১. দ্বাদশোপদেশগাথা; ১২. স্বাধিষ্ঠানক্রম; ১৩. তত্ত্বোপদেশশিখরদোহাগীতি; ১৪. ভাবনাদৃষ্টি চর্যাফলদোহাগীতি; ১৫. বসন্ততিলক দোহাকোষগীতিকা এবং ১৬. মহামুদ্রোপদেশবজ্রগুহ্যগীতি।

তাঁর রচিত যে-সব সংস্কৃত গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় তার নাম নীচে প্রদত্ত হল:

১. বুদ্ধকপালতন্ত্রপঞ্জিকা জ্ঞানবতী; ২. বুদ্ধকপালসাধন; ৩. বুদ্ধকপাল মণ্ডলবিধি; ৪. ত্রৈলোক্য বশংকর লোকেশ্বর সাধন; ৫. ত্রৈলোক্যবশংকরলোকেশ্বরসাধন।

সরহের অপভ্রংশ ভাষার সর্ববিখ্যাত কৃতি দোহাকোষ বা দোহাগীতি নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর 'দোহাকোষনাম চর্যাগীতি' গ্রন্থে দোহা অপেক্ষা চৌপাই ছন্দের আধিক্য দেখা যায়, এতে মনে হয় দোহা শব্দের অর্থ ঠিক বর্তমানে যা পাওয়া যায় অতীতে তা ছিলনা। তা ছাড়া কোষ শব্দের অর্থ ঠিক শব্দকোষের অর্থে ছিল না, এটি সংগ্রহ অর্থে ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ দোহাকোষ ছিল মূলত: দোহা সংগ্রহ। এভাবে আমরা দেখি প্রাকৃত ভাষায় রচিত 'গাথা সপ্তশতী 'গাথাকোষ' নামেও একসময় পরিচিত ছিল। তিব্বতী অনুবাদে যে-সমস্ত দোহাকোষ সংগৃহীত হয়েছে তার মধ্যে সরহপার দোহাকোষ ছাড়াও লূঈপা, বীরুপা, কণহপা এবং তিলোপার দোহাকোষও আছে। তিব্বতী ভাষায় এই সাত জনের দোহাকোষ সপ্তকোষ নামে পরিচিত যা সিদ্ধাগণের অপরিহার্য পাঠ্য।

শবরপা সরহপার প্রধান শিষ্য ছিলেন। শবরপাকে শররেশ্বরও বলা হত। সরহপার অন্যান্য শিষ্যের মধ্যে নাগার্জুন এবং সর্বভক্ষ এই দুটি নাম পাওয়া যায়। এই নাগার্জুন নিশ্চয়ই আচার্য নাগার্জুন নন। কেননা আচার্য নাগার্জুন আরো অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিব্বতী গুরুপরম্পরায় লূঈপা ছিলেন প্রথম সিদ্ধ।

নালন্দা, বিক্রমশীলা এবং জগওলার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহার যখন বখতিয়ার খিলজীর অধিকারে আসে তখন ভারতীয় সংঘরাজ শাক্যশ্রী ভদ্রের সঙ্গে যে-সমস্ত শরণার্থীদের মণ্ডলী তিব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে শাক্যশ্রী ভদ্রের শিষ্য বিনয়শ্রীও ছিলেন। বিনয়শ্রী তিব্বতের স-স্ক্য বিহারে অনেকদিন পর্যন্ত ছিলেন। সম্ভবত ভারতে তিনি আর প্রত্যাগমন করেননি। এই বিহারে যে-সমস্ত হস্তলিখিত মূল্যবান পুঁথি পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে বিনয়শ্রী রচিত সিদ্ধাদের নামানুস্মরণও ছিল। বিনয়শ্রী রচিত এই নামানুস্মরণ বা গুরু-পরম্পরা নিম্নে প্রদত্ত হল; লূঈ, বিরূআ, কমল, কলক্কল, চলণা, কাংকণ, কহ্নদেব, ডোম্বি, বীণা, নাগ, হরণা, ভাট, ভাদে, ভুসুকু, কোকিল, যোগী, বাজপাচে, নীলপ, ডেডংকিপা, মেখলা, সরহ, শবর, তৈলোও, কুক্কুরীপা, অপসিদ্ধা, চন্দনকৃষ্ণপা, আমাহিল, বীর সম্বরা, সুগতভূষণ ধোকড়ি, তান্তি, ধামধুম, কপিল থাকলি, সব্বভকষ, সান্তি, চাটপা, লক্ষ্মী, অনতিন, মহিধর, সুখমদেবকহ্নপা, জউড়ি, বিরউ, যতীন, অচিন্ত, দারিক, গুড়বী, গগনা, কাম্বলি, ঘন্টা, শ্রীজলন্ধর, নাগ, আর্যদের এবং নাগার্জুন।

এই সূচির মধ্যে অনেক নাম আছে যেগুলো চুরাশী সিদ্ধাদের প্রামাণিক-সূচিতে পাওয়া যায় না। সম্ভবত এই তালিকাটি একান্তভাবে বিনয়শ্রীর গুরু-পরম্পরার তালিকা। গোরক্ষনাথ, যিনি ভারতবর্ষের সর্বত্র একজন শ্রদ্ধেয় সিদ্ধা হিসেবে গণ্য, তিনি সরহপার শিষ্য-পরম্পরার মধ্যেই ছিলেন—যে পরম্পরাকে এভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়: সরহ > শবর > লূঈ > দারিক > ঘন্টা > জলন্ধর > মৎস্যেন্দ্র।

সরহর সময়কালের সংস্কৃত এবং প্রাকৃত উভয় সাহিত্যই বিশিষ্ট সমৃদ্ধিতে উপনীত হয়েছিলো। অশ্বঘোষ, ভাস, কালিদাস-এঁদের কাব্য এবং নাটক; সুবন্ধু, দণ্ডী এবং বাণ—এদের গদ্য রচনা; ভামহ'র সাহিত্য-মীমাংসা সে-কালের প্রসিদ্ধ কীর্তি।[১০] সরহপা সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত ছিলেন এবং নালন্দায় অধ্যাপক ছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর সময়কালে প্রচলিত উল্লেখযোগ্য কাব্য, নাটক, গদ্য এবং মীমাংসা পাঠ করেছিলেন। তিনি ইচ্ছে করলে তৎকালীন সাহিত্যের 'শিষ্ট সরণী' অনুসরণ করে একজন সফল কবি হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি জনসাধারণের কথা চিন্তা করে লোকসাহিত্য অনুসরণ করেন। তাঁর কাব্যে শাস্ত্র-সম্মত গুণাবলীর অভাব নেই যদিও তা লোকজ নিষ্ঠার প্রতীক। তাঁর 'দোহাকোষ চর্যাগীতি'তে প্রচুর উপমা-রূপক রয়েছে। দু:খের বিষয় সরহর অনেক কৃতি তিব্বতী অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের হস্তগত হয়েছে, মূল ভাষায় সেগুলো আমরা পাইনি। কয়েকটি উপমা নিম্নে বাংলাতে উপস্থিত করছি:

১. যেমন জলধর সাগর থেকে জল গ্রহণ করে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়।
২. যেমন সাগরের লবণাক্ত জল জলধরের মুখগহ্বরে পড়ে মিষ্টত্ব লাভ করে।
৩. যেমন পুষ্পে সংগুপ্ত মধুর সংবাদ মধুমক্ষিকা জানে।
৪. যেমন দর্পণে উদ্ভাসিত রূপকে অন্ধ বুঝতে পারে না।
৫. ফুলের গন্ধের রূপ নেই কিন্তু তবুও তা প্রত্যক্ষ সর্বত্র ব্যাপ্ত।

শিষ্ট সাহিত্যে নেই কিন্তু লোক-সাহিত্যে আছে এমন অনেক উপমা-রূপক এবং ভঙ্গী সরহর 'দোহাকোষে' আমরা পাই। একই প্রকৃতির উপমা-রূপক এবং ভঙ্গী গোরক্ষ, কবীর, নানক, দাদু আদিসন্তদের রচনায়ও পাওয়া যায়। সরহর উদ্দেশ্য ছিলো মানুষকে জ্ঞানী করা এবং জীবনে জীবের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করা। যেহেতু সাধারণ জনগণের স্মরণ এবং বোধের আয়ত্তে তত্ত্বকথাকে তিনি আনতে চেয়েছিলেন, তাই তৎকালে যে-পদ্ধতিতে নানা শাস্ত্রের উপর গ্রন্থ রচিত হত সে-সব পদ্ধতিই তিনি অবলম্বন করেছিলেন। প্রচলিত শ্লোক বন্ধন বা কারিকা বন্ধন গ্রহণ করে তিনি লৌকিক ছন্দে তাঁর তত্ত্ববিচারকে সাজিয়েছিলেন।

'দোহাকোষ-গীতি' থেকে মূল ভাষায় কয়েকটি উপমা উপস্থিত করছি:

১. অপ্পা পরহি ণ মেলবিউ গমণ্যাগমণ ণ-ভাগ্গ।
তুস কুউন্তে কাল গউ চাউল হত্থ ণ লাগ্গ।।

(আপন পর বিচারে আপন পর কাউকেই পাওয়া গেলনা। তুষ কুটতে সময় অতিবাহিত হল হাতে এক কণা চাউল এলোনা।)

২. অণ্ণ তরঙ্গ কি অণ্ণ জলু, ভব-সম খ-সম সরূঅ।

(অন্য তরঙ্গ কি অন্য জল, ভব-সম খ-সম স্বরূপ।)

৩. জিম জলেহি সসি দীসই ছায়া।
তিম ভবে পড়িহাসই সঅলবি মাআ।।

(যেমন জলে শশীর ছায়া দেখা যায়, তেমনি পৃথিবীতে প্রতিভাত বা দ্রষ্টব্য সব কিছুই মায়া।)

যেহেতু সরহ রহস্যবাদী ছিলেন, তাই তাঁর সকল বিবেচনা রহস্যোক্তি হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সেগুলো সাধারণ মানুষের সহজ-গ্রাহ্যতার বাইরে যায়নি। সাধারণ মানুষ আপাত-স্পষ্ট অর্থকে গ্রহণ করে ক্রমশ গভীরে যাবার চেষ্টা করেছে। সে-সময়কার নিম্নে উদ্ধৃত গীত[১১] অপরূপ কাব্য-গুণান্বিত:

উঁচা-উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গী পিচ্ছি পরহি সবরী গীবত গুঞ্জরী মালা।
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী-গুহাড়া
তোহারি ণিঅ ঘরিণী সহজ সুন্দরী। ধ্রু।
ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলি ডালী।

একলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী।
অ 'ধউ খাউ পড়িলা সবরো মহাসুহ সেজ্জি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ ণইরামণি দারী-পেক্খ রাতি পোহাইলী।
হিএ তাবোলা মহাসুহে কাপুর খাঈ।
সূন নিরামণি কণ্ঠে লইআ মহাসুহে রাতি পোহাঈ।
গুরু বাক পুঞ্জআ বিন্ধ ণিঅ মণে বাণে।
একে শর-সন্ধানে বিন্ধহ বিন্ধহ পরম নিবাণে।
উমত সবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর সিরে সন্ধি পাইমন্তে সবরো লোড়িব কইসে।

"উঁচা উঁচা পর্বতের উপরে শবর-বালিকা বসে আছে, তার শিরোদেশে ময়ূর পুচ্ছ এবং গ্রীবায় গুঞ্জার মালা। তার প্রিয় শবর প্রেমে উন্মত্ত। 'হে শবর তুমি কোলাহল কোরোনা। তোমার নিজ গৃহিণী সহজ সুন্দরী।' পর্বতের উপর নানা প্রকার তরুবর প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে, তাদের ডাল গগনে লেগেছে। কানে কুণ্ডল-বজ্র ধারণ করে শবরী একাকিনী বনে ভ্রমণ করছে। দৌড়ে গিয়ে খাটের উপর--মহাসুখ-সেজের উপর শবর শুয়ে পড়লো। ভুজঙ্গ এবং নৈরাত্ম দারীকে দেখে শবরের রাত পোহালো। হৃদয়-তাম্বুলকে মহাসুখরূপী কর্পূরের সঙ্গে আহার করে এবং শূন্য নৈরাত্মাকে কণ্ঠে ধারণ করে মহাসুখে শবরের রাত কাটলো। গুরু-বচন জেনে নিয়ে আপন মনরূপী বানে বিদ্ধ হও, পরম নির্বাণকে একই শর-সন্ধানে বার বার বিদ্ধ কর।"

এখানকার সাঙ্কেতিক শব্দগুলোর প্রতি ধ্যান না করলেও গীতটি উপভোগ করা যায় একটি শৃঙ্গারী কবিতা হিসেবে। তত্ত্বের দিক থেকে এখানে বৌদ্ধ বিশ্বাসের মূল কথাটি এসেছে। জগৎ এবং জগতের সকল পদার্থের অন্তস্থলে কোনও নিত্য পদার্থ নেই যেমন আত্মা বা ব্রহ্ম। সবকিছুই আত্ম-রহিত বা নিরাত্মা বা নৈরাত্ম বা নিরামণি। সাধককে এই নৈরাত্ম তত্ত্ব-শূন্যতার সাক্ষাৎ পেতে হবে।

পূর্বেই বলেছি সরহপা 'সহজ' বা নৈসর্গিক জীবনবেদের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনিই ছিলেন 'সহজবাদে'র প্রথম আচার্য তাই তাঁর মতবাদকে 'সহজযান' বলা হয়। সরহপা বলছেন-

জ্ঞান-হীন পব্বজ্জে রহিঅউ।
গহী বসন্তে ভাজ্জে সহিঅউ।।

অর্থাৎ 'জ্ঞানহীন প্রব্রজ্যায় থাকে এবং গৃহী বসন্তে ভার্যার সঙ্গে থাকে।'

সরহ জীবনে ভোগকে ত্যজ্য করেননি কিন্তু ভোগের প্রতি আসক্তিকে ত্যজ্য করেছেন। তিনি আসক্তির জীবনের বিরোধী ছিলেন। সরহ ভিক্ষুদের চীবর প্রত্যাখ্যান করে তাদের নিয়মও অস্বীকার করেছিলেন। সরহ বলেছেন:

বিসঅ রমন্ত ণ বিসঅহি লিপ্পই।
উঅঅ হরন্ত ণ পাণী ছুপ্পই।।

অর্থাৎ 'বিষয়ের মধ্যে রমণ করবে কিন্তু বিষয়ে লিপ্ত হবে না। পানি তুলতে গিয়ে পানি স্পর্শ করবে না।'

রাহুল সাংকৃত্যায়ন বলছেন যে সরহ শুধু যোগী নন, যোগীশ্বর ছিলেন। কিন্তু সরহ ধ্যান-সমাধিকে সম্মান করলেও তিনি যোগীদের ভ্রান্তি সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। তিনি মূঢ় যোগীদের যোগসাধনাকে কাষ্ঠযোগ বলেছেন–

পবণ ধরি অপ্পাণ ম ছিন্দহ।
কট্ট-জোঅ নাসাগুণ ম বিন্দহ।।

শ্বাস বন্ধ করে নাসাগ্রে চিত্ত স্থাপন করে যোগী নিজেকে চমৎকারভাবে দর্শনীয় করেন, কিন্তু এটাতো একই সঙ্গে আত্ম এবং পর-বঞ্চনা। চিত্ত, মন এবং বিজ্ঞান বৌদ্ধ পরিভাষায় একই বীজের ভিন্ন ভিন্ন নাম। চিত্তের অপার শক্তি আছে। সরহ তা মানতেন এবং তার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করাকে তিনি পরম পুরুষার্থ হিসেবে গণ্য করতেন। কিন্তু লোক দেখানো যোগের খেলার তিনি বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। চিত্ত সম্পর্কে তিনি বলছেন–

ক. চিত্তেক চিত্ত সঅল বীঅ ভব-নিব্বাণা জন্ম বিফুরন্তি।
তং চিন্তামণি-রূঅং পণমহ ইচ্ছাফলন্দেই।।

চিত্ত এক, চিত্ত সকল বীজ, ভব-নির্বাণ তার মধ্যে বিস্ফূরিত হয় চিত্তই চিন্তামণিরূপ। তার সেবা কর, সে ইচ্ছা-ফল প্রদান করবে।

খ. বজ্ঝই কম্মেণ জনো কম্পবিমুক্কেন হোই মণমুক্কো।
মণ-মোক্খেণ অণুঅরং পাবিজ্জই পরম নিব্বাণং।

মানুষ কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কর্ম থেকে মুক্ত হলে মন মুক্ত হয় এবং ত্বরিৎ গতিতে পরম নির্বাণ লাভ করে।

গ. চিত্তে বদ্ধে বজ্ঝই মুক্কে মুক্কই ণত্সি সন্দে হো।।

জোর করে চিত্তকে বশীভূত করে রাখা যায় না।

ঘ. এহু ণিঅ মণ তুরঙ্গ সুচঞ্চল
মেলহি সহাব ট্ ঠাঅ দো ণিম্মল।।

এই চঞ্চল তরঙ্গ-মনকে তার স্বভাবের উপর ছেড়ে দিলে সে নির্মল হয়ে স্থির থাকবে।

সরহপা আচারের জীবনের উপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে করুণা এবং শূন্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। করুণা এবং শূন্যতার যুগনদ্ধ সম্বন্ধ নির্মাণ করে তাকে কার্যকর করতে হবে, এটাই তাঁর বক্তব্য। তিনি তাঁর জীবনে অদ্বয়

করুণাশূন্যতার সাধনা করেছেন এবং সকলের উপর অপার করুণা বর্ষণ করেছেন। তিনি এক স্থানে বলেছেন, 'দান এবং পর-উপকার ছাড়া এ-সংসারে বাস করে কি লাভ? এর চেয়ে সংসার ত্যাগ করাইতো ভালো।' অন্যত্র বলেছেন, 'আত্ম-পর ভেদ দূর করা সাধকের পরম কর্তব্য।'

সরহপার সাধনমার্গের নাম সহজযান বা বজ্রযান, একথা আগেই বলেছি। অসঙ্গের 'যোগাচার' এবং নাগার্জুনের 'মাধ্যমিক' মার্গের সঙ্গে সহজযানের মিল আছে। সব কয়টিরই মূল ভিত্তি 'শূন্যতা'র উপর। যেখানে ভৌতিক অভৌতিক সকল পদার্থকে তাদের নিত্য সারবস্তু থেকে রহিত করাকে যোগ-সাধনার পরম লভ্য জ্ঞান করা হয়েছে। করুণা তথা শূন্যতা ভাবনার যুগনদ্ধ রূপকে আবিষ্কার করাই পরম পুরুষার্থ। বৈভাষিক এবং সৌত্রান্তিক এ-দুটি হীনযানী বৌদ্ধ-দর্শন দ্বৈতবাদী। বৈভাষিক বা সর্বাস্তিবাদী এবং স্থবিরবাদী 'ভূত' এবং 'চেতনা' উভয়কেই মান্য করে থাকে। 'ভূত' হচ্ছে 'রূপ' এবং 'চেতনা' হচ্ছে বিজ্ঞান। সৌত্রান্তিকরা বাহ্য পদার্থকে গ্রাহ্য করেও বিজ্ঞানের অপলাপ চাননা, সুতরাং এ-ক্ষেত্রে দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু যারা 'মাধ্যমিক' তাঁরা অন্তর এবং বাহ্য সকল পদার্থকে সারশূন্য বা নিত্যতত্ত্ব-শূন্য মনে করেন। যোগাচারীরা একটি মাত্র 'বিজ্ঞান' বা চেতনা-তত্ত্বকে স্বীকার করেন এবং তাঁদের বিবেচনায় চেতনা নিত্য নয় কিন্তু ক্ষণিক প্রবাহ রূপে সনাতন। সুতরাং যোগাচারীরা অদ্বৈতবাদী। সরহপা স্বয়ং অদ্বৈত তত্ত্বকে স্বীকার করতেন। সুতরাং যোগাচার-দর্শনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিলো এটা নিশ্চিতভাবে মেনে নেওয়া যায়। যোগাচার-দর্শনের বিজ্ঞান-বোধের দুটি বিভাজন আছে--বৈয়ক্তিক বিজ্ঞান এবং মহাবিজ্ঞান। বৈয়ক্তিক বিজ্ঞান প্রবৃত্তি বিজ্ঞান বলে পরিচিত এবং মহাবিজ্ঞান আলয়-বিজ্ঞান রূপে। বিশ্বের সকলই দৃশ্যাদৃশ্য পদার্থ যার পরিণাম আছে এবং সেগুলো সর্বত্রব্যাপী অভৌতিক তত্ত্ব-আলয় বিজ্ঞান। আবার সেগুলো সমুদ্রের মতো আপন ক্ষণিকতার স্বভাবের কারণে সর্বসময় তরঙ্গিত থাকে। এই তরঙ্গ হচ্ছে প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান যাকে আমরা রূপ বা অরূপ স্থিতির মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। সরহপা বলেছেন—

আলয় তরু উমলই হিওই জগ ছ্যাছ্যাদ।

যোগাচার-দর্শনের প্রবর্তক অসঙ্গের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসুবন্ধু 'আলয়' সম্পর্কে বলেছেন—"বীচীতরঙ্গ-ন্যায়েন তদুৎপত্তি।" বসুবন্ধু আলয়-বিজ্ঞানকে বলেছেন 'সমুদ্র', এবং সরহ বলেছেন স্বচ্ছন্দে হিল্লোলিত তরুবর। এ-কারণে 'স্বচ্ছন্দে' বলেছেন যে বৃক্ষকে হিল্লোলিত করবার জন্য দ্বিতীয় কোনও শক্তি নেই--সে আপন

স্বভাবেই হিল্লোলিত থাকে। মনে রাখতে হবে যে বৌদ্ধ হিসেবে সরহপা অনীশ্বরবাদী এবং অনাত্মবাদী ছিলেন।

কর্মের বন্ধন থেকে যে মুক্ত হয় তাকে নির্বাণ-প্রাপ্ত পুরুষ বলা যেতে পারে। বন্ধন থেকে মুক্ত অর্থ আসক্তি থেকে মুক্ত কেননা মূলত: আসক্তিইতো বন্ধনদশা নির্মাণ করে। নির্বাণ-মন হচ্ছে সেই মন যে-মন ভাব-বন্ধন অথবা কর্মপাশ থেকে মুক্ত; এহেন নির্বাণস্থিতিকে সরহপা মূল-রহিত বলেছেন, তাঁর ভাষায় 'মূল-রহিঅ'। শূন্য এবং আলয় উভয়কে প্রতিপালন করে সরহপা। রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভাষায়, 'গোনাচার-মাধ্যমিক' হয়েছিলেন। ভব-নির্বাণের কথা সরহপা বলেছেন কিন্তু সংসারকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে বলেননি, বরঞ্চ সংসারের মধ্যে থেকে সাংসারিক আসক্তি-যুক্ত হতে বলেছেন।

সরহ'র দৃষ্টিতে মুক্তি হচ্ছে স্বত:সিদ্ধ বস্তু। শঙ্করাচার্য তাঁর পরমার্থ-জ্ঞানে বলতে চেয়েছেন-জীবের কল্পনা মিথ্যা এবং পরমার্থে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। সরহ ব্রহ্মাকে স্বীকার করেননি এবং জগৎকে ত্যজ্য বলেননি। জগৎকে তিনি ক্ষণিক এবং মূল্যবান স্থিতি বলে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে প্রত্যক্ষকে ছেড়ে পরোক্ষের পিছনে ধাবিত হওয়া মূর্খতা। সরহর দৃষ্টিতে পরমপদ মনের এক বিশেষ অবস্থা হচ্ছে—

জহিঁ ন্মণ মরই পবণহো তহিঁ লঅ জাই।
এহু সো পরমমহাসুহ সরহ কহিহউ জাই।।

—অর্থাৎ মনের শঙ্কাযুক্ত স্থিতি চলে গেলে তার চঞ্চলতা দূর হয় এবং তখন পরম মহাসুখের স্থিতি আসে।

সরহ বলছেন যে পরমপদ হচ্ছে শূন্য এবং নিরঞ্জন—উপনিষদের নিরঞ্জন নয় কিন্তু শূন্যবোধগত নিরঞ্জন। নাদ এবং বিন্দুতে যে নেই, অক্ষর-বর্ণ বিবর্জিত সেই তো পরম মহাসুখ যা ত্যজ্য নয়, গ্রাহ্যও নয়।

দুই

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে রাহুল সাংকৃত্যায়ন তিব্বতের স্‌স্ক্য মঠে সরহপা'র 'দোহাকোষে'র একটি প্রাচীন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। সম্ভবত: এ-পাণ্ডুলিপিটিই প্রাচীনতম। এ-পাণ্ডুলিপিটি অবলম্বন করে তিনি দোহাকোষ সম্পাদিত করেন। হস্তলেখন দৃষ্টে রাহুলের বিশ্বাস জন্মে যে পাণ্ডুলিপিটির অনুলিপি-কাল দশম-একাদশ শতাব্দী হবে। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী সর্ব প্রথম সরহপার 'দোহাকোষ' সম্পাদনা করেছিলেন, রাহুলের সম্পাদনার উনিশ বছর পূর্বে তাঁর সম্পাদিত 'দোহাকোষ' ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত হয় (Calcutta Sanskrit Series, 1938) এবং

রাহুলের 'দোহাকোষ' প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। প্রবোধ বাগচীর সম্পাদিত দোহার সংখ্যা ১১২। স্.স্ক্য মঠের পাণ্ডুলিপিতে রাহুল ১৬৪টি দোহা পেয়েছিলেন। তিব্বতী অনুবাদে ১৩৫টি দোহা আছে (তেরগী স্তন্ গয়ুর)।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অদ্বয়বজ্রের সংস্কৃত টীকাসহ সরহপার যে দোহাকোষ নেপালে পেয়েছিলেন, কোনরূপ সম্পাদনা ছাড়াই তা' মুদ্রিত করেন। শাস্ত্রী, বাগচী এবং রাহুলের গৃহীত পাঠের মধ্যে পারস্পরিক অন্তর নিম্নে প্রদর্শিত হল:

শাস্ত্রী: 'বিষয় রমন্তন বিস অ বিলিপণই।
উঅর হরই ণ পাণী খিপ্যই।।"
বাগচী: "বিসঅ রমন্তণ বিসএঁ বিলিপ্পই।
উঅর হরই ণ পাণী ছিপ্পই।।"
রাহুল: 'বিসঅ রমন্তেণ বিসঅহিঁ লিপ্পিই।
উঅল হরন্তে ণ পাণী ছপ্পই।।"

তিব্বতী অনুবাদটি নিম্নরূপ:

"যুল্. নম্স্ বস্তেন্. পস্.
যুল্. গ্যিস্. মি. গোস্. সো।।"

অন্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি:

শাস্ত্রী: "দেব পিজ্জই লক্ষ বি দীসই।
অপ্যণু মারীঈ সকি করিঅই।।"
বাগচী: "দেব পিজ্জই লকখবি দীসই।
অপ্পণু মারিই স কি করিঅই।।"
রাহুল: 'দেব পুদিজ্জঅ ল কখবি দিজ্জঅ।
অপ্পউ মারী কীস করিজ্জঅ।।"

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র গবেষণা-সন্দর্ভ Les Chants mystiques de Kanha et de Saraha প্যারিসে প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে। তিনি শাস্ত্রী কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে কাহ্নপা এবং সরহপার দোহাকোষ ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। আলোচনাসূত্রে তিনি দোহাকোষ দুটির ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং কাহ্ন ও সরহর জীবনবৃত্তান্ত উপস্থিত করেন। দোহাকোষগুলোর ব্যাকরণ ও ধ্বনিতত্ত্বও তিনি আলোচনা করেন। তিনি তাঁর গবেষণা-সন্দর্ভে তিব্বতী অনুবাদও যুক্ত করেছিলেন। অবশ্য তাঁর মূল উপকরণগুলো শাস্ত্রীর। শাস্ত্রী নেপাল রাজদরবার গ্রন্থাগারে রক্ষিত তালপাতার পুঁথি অবলম্বন করে সরহপার দোহাকোষের পাঠ উদ্ধার করেছিলেন। শাস্ত্রীর গ্রন্থ প্রকাশিত হয় কলকাতার ১৯১৬ সালে। সুতরাং দোহাকোষটির বিভিন্ন মুদ্রণের ক্রম নিম্নরূপ:

১. শাস্ত্রী ১৯১৬
২. শহীদুল্লাহ্ ১৯২৮
৩. বাগচী ১৯৩৮
৪. রাহুল ১৯৫৭

স্. স্ক্য মঠের পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত রাহুলের গবেষণাটিই এ-পর্যায়ের সর্বশেষ গ্রন্থ এবং যথার্থ ও সর্বশ্রেষ্ঠও বটে।

বাংলা ভাষায় সরহপার 'দোহাকোষ' নিয়ে আলোচনা করবার প্রথম প্রয়াস আমার। আমি পূর্বোক্ত সকলের পাঠ পরীক্ষা করবার সুযোগ পেয়েছি এবং রাহুলের গ্রন্থে সঙ্কলিত তিব্বতী অনুবাদও বিবেচনায় এনেছি।

চর্যাগীতিকায় সরহ্ রচিত চারটি গীত পাওয়া গিয়েছে-ভৈরবী, গুঞ্জরী, দেশাখ এবং মালসী রাগে গেয়। 'ভৈরবী' একটি প্রসিদ্ধ রাগিনী। 'গুঞ্জরী সমভবত: 'গুর্জরী', 'দেশাখ' একটি একটি প্রাচীন রাগ এবং 'মালসী' হচ্ছে 'মালবশ্রী'। বিবিধ রাগ-রাগিণীর উপর সরহ'র যে অধিকার ছিলো একয়টি রাগ-রাগিনীর উল্লেখেই তা' স্পষ্ট। আবার 'দোহাকোষগীতি'তে বিবিধ ছন্দের ব্যবহার পাই, যেমন 'দোহা', 'সোরঠা', 'পাদাকুলক', 'অড়িল্ল', 'গাথা', 'রোলা', 'উল্লালা', 'মহানুভাব' এবং 'মরহট্ট'। এ-সব ছন্দ নিয়ে বিশ্লেষণ নিরর্থক বিধায় এখানে উল্লেখ করলাম মাত্র।

সরহপার ভাষার[১২] বর্ণমালায় বর্তমান সময়ে ব্যবহৃত বাঙলা দেবনাগরী বর্ণমালার কিছু বর্ণ নেই এবং সে-সময়কার ভাষার যথাযথ উচ্চারণের জন্যও কিছু বর্ণ বাংলা-হিন্দী বর্ণমালায় নেই। স্বরধ্বনির মধ্যে 'ঋ, ঌ, এ, ঐ',-এর অভাব ছিলো এবং ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে 'শ' এবং 'ষ'-এর। বাংলার মতো 'স'-এর উচ্চারণ ছিলো 'শ'-এর মতো। তেমনি 'য'-এর উচ্চারণ বাংলা 'জ'-এর মতো ছিলো। হিন্দীতে দুটি 'ব' পাওয়া যায়, একটির উচ্চারণ 'ব' এবং অন্যটির উচ্চারণ 'ওয়া'। কিন্তু সরহপার ভাষায় আমরা বাংলার মতো একটি উচ্চারণ পাচ্ছি 'ব'।

সংস্কৃতের সঙ্গে তুলনা করলে স. স্ক্য পাণ্ডুলিপির অপভ্রংশ ভাষার নিম্নলিখিত প্রভেদ পাওয়া যায়:

ক. লোপ–
অ. অহম্ > হউঁ
ই. ইচ্ছ> চাহ
: . নি:সার > নিসার
ত. জগত্ > জগ
স্. স্নেহ > ণেহ

খ. আগম-
ক্. লিখ > লিক্খ, এক > এক্ক
চ্. ছেদ > চ্ছেঅ, ছুবই
ণ্. বিহীন > বিহুন > বিহুণ্ন
ব্. এব > এব্ব
গ. বিকার-
অ> আ: অন্তর > আন্তর
অন > আণ
অপি> অউ: অদ্য় অপি> অজ্জ অউ> অজ্জউ
আ> অ : আগমন > অমণ
অব > ও : লবণ > লোণ

বিকারের অজস্র উদাহরণ আছে, এখানে মাত্র কয়েকটি দেখানো হল, তেমনি লোপ এবং আগমেরও।

সংস্কৃত, পালী এবং প্রাকৃতে পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্লীব বা নপুংসক লিঙ্গ এ-তিন প্রকার লিঙ্গভেদ বিদ্যমান ছিলো। অপভ্রংশে ক্লীব লিঙ্গ লোপ পেল। সরহপার ভাষায় লিঙ্গভেদ নিম্নরূপ পাচ্ছি-

পুংলিঙ্গ: অ-কারান্ত, যেমন 'কোণ', 'খবণ' 'চেল্ল > চেলা', 'তউ> তট'।

আ-কারান্ত: যেমন 'ঘন্টা'।

ই-কারান্ত: যেমন, 'অইরি < আর্য, 'অগগি', < আগ', 'হথি < হাথী' 'গিরি', 'মুণি', 'রবি'।

ঈ-কারান্ত: 'অত্থী < অর্থী', 'জোঈ < যোগী', 'দণ্ডী', 'পাণী'।

উ-কারান্ত: 'অণু', 'গুরু', 'পসূ < পশু'।

স্ত্রীলিঙ্গ: আ-কারান্ত: যেমন, 'ইচ্ছা', 'কাআ', 'দীবা', 'পব্বজ্জা' 'পব্বজ্জা'. 'ভাজ্জা < ভার্যা', 'মুদ্দা > মুদ্রা', 'সুরঙ্গা > সুরঙ্গ'।

ই-কারান্ত: যেমন, 'অক্খি', 'ইন্দি' জুবই', 'মিটটি', 'জোইণি', 'বোহি', 'মণি,' 'মাই', 'সহি', 'সিরি'।

ঈ-কারান্ত: যেমন, 'কুমারী', 'ণঈ < নদী', 'রণ্ডী'।

সর্বনামের উদাহরণ:

অণ্ন, এহু, কো, জো, মই, সব্ব সো।

সংখ্যার উদাহরণ:

এক, একক; বিণ্নি, বেণ্নি, বেই, দুই; তিণ্ন; চার, চউ, চউট্ট; পঞ্চ; দস; চউজহ (চৌদ্দ), সআই (শত)।

সুবন্ত বা বিভক্তির রূপ;
এক বচনের রূপ:
প্রথমা: উ, ও
দ্বিতীয়া: চিহ্ন পাওয়া যায় না।
তৃতীয়া: এ, এহি, এণ
চতুর্থী: চিহ্ন নেই
পঞ্চমী: এঁ, লই, হ, হিঁ
ষষ্ঠী: কেরী, কের, তণঅ
সপ্তমী: এহি, এ, হি
সংবোধন : অরে, বে, য়ে, হলে, হে
বহুবচনের রূপ:
প্রথমা : আ, এঁ
দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী : চিহ্ন নেই
ষষ্ঠী ও সপ্তমী : চিহ্ন নেই
সর্বনামের রূপ : মৈঁ (একবচন)
প্রথমা: মই, হউ
দ্বিতীয়া: মহু
তৃতীয়া: মই
চতুর্থী: মহু
পঞ্চমী ও ষষ্ঠী : চিহ্ন নেই
সপ্তমী: মই
বহুবচন:
প্রথমা, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী : চিহ্ন নেই
দ্বিতীয়া: অম্হা
তৃতীয়া: ম
'তু' সর্বনাম সরহপার ভাষায় নেই।
'সো' আছে:

একবচন	বহুবচন
প্রথমা : সা, সে, সু, সা	তা, সো
দ্বিতীয়া : সো, তঁ	তহি
তৃতীয়া : তেণ, তিএ	

ষষ্ঠী : তসু
'অণ্ন' সর্বনাম:-
প্রথমা : অণ্ন
'এহু' সর্বনাম:-
প্রথমা : এহু
'কো' সর্বনাম:-
প্রথমা : কো, কবণ
তৃতীয়া: কেণ
ষষ্ঠী: কসু, কাসু
'জো' সর্বনাম:-
প্রথমা: জো, জে
দ্বিতীয়া: জে
তৃতীয়া: জেণ
ষষ্ঠী: জসু
সপ্তমী: জহি

'দোহাকোষে' ব্যবহৃত কয়েকটি 'অব্যয়' এবং 'উপসর্গে'র উদাহরণ দিচ্ছি।
অব্যয়-
অগ্‌গে, অরে, ই, ইঅ, উণো, এম, খলু, জই, তিম ইত্যাদি।
উপসর্গ-
অ (নিষেধার্থ), অহ, উঅ, সু, সম ইত্যাদি।

সমাসের উদাহরণ;
কর্মধারয়-ঘোরান্ধার; তৎপুরুষ-জোইণিচার; দ্বন্দ্ব-চিত্তাচিত্ত; বহুব্রীহি-অভিন্নমই।

সরহপার 'দোহাকোষে' বর্তমান, ভবিষ্যৎ, অতীত এবং আজ্ঞা ক্রিয়ার নিম্নপ্রকার উদাহরণ পাই:

১. বর্তমান-প্রথম পুরুষ একবচনে অ, ই প্রত্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন জাণ, জাঅ, আণঅ, জাই, জাণই, ধাই, ণাসই, তুট্‌টই, দেই, দেক্‌খই, ধাবই, পইসই, বজঝই। মধ্যমপুরুষের ক্ষেত্রে 'সি' প্রত্যয়ের প্রয়োগ হত, যেমন 'জাণসি', 'পাবসি', 'পরিআণিসি'। উত্তমপুরুষের একবচনে 'মি' ব্যবহার হত, যেমন 'কহমি' 'জাণমি', 'জোঅমি', 'পুচ্ছমি'। প্রথম পুরুষ বহুবচনে সরহ 'ন্তি', 'ন্তে' প্রয়োগ করেছেন, যেমন বজ্‌ঝন্তি', 'হোন্তি', 'রমন্তে'।

২. ভবিষ্যৎ--প্রথম পুরুষে 'ইহই', 'ই'। মধ্যম পুরুষে 'ঈহসি'।

৩. অতীত -- অতীত কালের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রত্যয় হচ্ছে 'অ', 'অউ', 'হঅউ', 'হউ'. 'উ'।

৪. আজ্ঞা--মধ্যম পুরুষে একবচনে 'ই', 'উ', 'হ', 'হি', 'হু'।

সরহপা এবং কাহ্নপার দোহা এবং চর্যাগীতি এবং পরবর্তীকালের গীতিকারদের বহুবিধ গীতি এখনও নেপালে বিদ্যমান আছে। নেওয়ারী ভাষায় 'চর্যা'কে 'চচা' বলা হয়। যেহেতু নেপালে নেওয়ারী এবং কিছু আঞ্চলিক ভাষা আছে এবং হিন্দীও আছে তাই 'চর্যা' গীতিতে শব্দগত অনেক পরিবর্তন এসেছে। গীতিকাগুলোর মূলতত্ত্ব সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয় এবং তাদের উচ্চারণও ভিন্ন, তাই 'চচা' গীতিতে মূল চর্যা এবং দোহার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নেওয়ারীতে 'ত' এবং 'ট'-এর উচ্চারণগত ভেদ নেই। 'র' এর স্থানে তারা 'ল' প্রয়োগ করে। যেমন চর্যার 'সতগুরূচরণ', 'চচা' গীতিতে হয়েছে 'সতগুলুচলন'। কাহ্নপা'র বজ্রগীতি অধিক পরিমাণে 'চচা' সঙ্গীতে রূপান্তরিত হয়েছে। তন্‌জুর মঠে রক্ষিত কাহ্নপার একটি বজ্রগীতি 'চচা' সঙ্গীতে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তার একটি উদাহরণ রাহুল দেখিয়েছেন, যেমন–

মুল: 'কোল্লই রে ঠিঅ বোল্ল, মুম্মু ণি রে কেক্কোলা।
ঘণই কিপীটহ বজ্রজই করুণে কিঅই ণ রোলা।।'
চচা: 'কোলয়ি রে থিয়া বোলা মূমূনি রে কঙ্কোলা।
ঘন কিয়া থী হোয়ি বজ্রায়ি করুণে কিয়ায়ি ন রোলা।।'

তথ্যনির্দেশ

১. সরহপার তত্ত্ব-সাধনা এবং কাব্যকীর্তি নিয়ে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী, রাহুল সাংকৃত্যায়নের পূর্বে উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। কিন্তু রাহুল সাংকৃত্যায়নই প্রথম সরহপা'র *দোহাকোষে*-র প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপি তিব্বতের সৃক্য মঠে আবিষ্কার করেন এবং তার উপর নির্ভর করে তাঁর 'দোহা-কোষ' প্রকাশ করেন। বিহার-রাষ্ট্রভাষা-পরিষদ, পাটনা থেকে তা প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে।

২. *দোহাকোষ*, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ভূমিকা: রাজনৈতিক স্থিতি, পৃষ্ঠা ১-৩।

৩. তুখারিস্তান সম্পর্কে এবং তুখারিস্তানে বৌদ্ধ প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিস্তৃত বিবরণ সম্পাদিত *রাজতরঙ্গিণী* গ্রন্থের পরিশিষ্টে রঞ্জিত সীতারাম পণ্ডিত দিয়েছেন। (*Rajtarangini:* Sahitya Academy, New Delhi 1968, Appendix D. page 729-734)।

৪. এঁদেরও অনেক পূর্বে তুখারিস্তান থেকে পণ্ডিত প্রভাকর মিত্র চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন। *রাজতরঙ্গিণী* গ্রন্থের পূর্বোক্ত পরিশিষ্টে সে সম্পর্কে আলোচনা আছে।

৫. প্রাণী-হিংসা থেকে বিরতি, পরস্বাপহরণ থেকে বিরতি, ব্যভিচার থেকে বিরতি, মিথ্যা-কথন থেকে বিরতি, মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরতি, বৌদ্ধ শাস্ত্রে পঞ্চশীল নামে অভিহিত। আচার্য অশ্বঘোষ তাঁর *সৌন্দরানন্দম* গ্রন্থে বলছেন, 'কান্তারে যেমন পথ-প্রদর্শকই একমাত্র আশ্রয়; জগতে তেমনি একমাত্র শীলকে আশ্রয় করেই চলতে হয়। শীলই একমাত্র মিত্র, বন্ধু, রক্ষা, ধন ও বলা। অতএব শীলের বিশুদ্ধি সম্পাদনে চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক।'

৬. নাগার্জুন তাঁর *মাধ্যমিক শাস্ত্র গ্রন্থে* 'শূন্যতা', 'অনুকম্পা', 'স্বভাব', 'প্রজ্ঞাপ্তি' এবং 'নিধান' বিষয়ে বৌদ্ধ বিশ্বাসকে ব্যাখ্যা করেছেন। সাধারণ পাঠকের জন্য National Book Trust, India কর্তৃক প্রকাশিত সচ্চিদানন্দ মূর্তির *Nagarjuna* গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য।

৭. শাস্ত্রীর সংগৃহীত *দোহাকোষে* এ-পাঠটি ভিন্নরূপে আছে—
"জই ণগ্গা বিঅ হোই মুত্তি তা শুনহ শিআলহ।
লোমোপপাটনে অচ্ছ সিদ্ধিঅ তা জুবইনিত্যস্বহ।।
পিচ্ছীগহণে দিঠি মোক্খ তা করিহ তুরঙ্গহ।"

৮. শাস্ত্রীর *দোহাকোষে* সরহপা'কে সরোজ বজ্র বলা হয়েছে।

৯. শূদ্রকের সময়কাল ৫৪০ খৃষ্টাব্দ। তাঁর একমাত্র নাটক *মৃচ্ছকটিক*।

১০. অশ্ব ঘোষ (খৃ. পূ. ৫০) *বুদ্ধচরিত* এবং *সৌন্দর্যনন্দ* গ্রন্থের রচয়িতা; ভাস *বালচরিত, দূতকাব্য, পঞ্চরাত্র, স্বপ্নবাসবদত্তা* ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা; 'কালিদাস' (৪০০ খৃষ্টাব্দ) সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি, *মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ* ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িতা; সুবন্ধু (খৃ. ৫৫০) *বাসবদত্তা* রচয়িতা; দণ্ডী (খৃ: ৫৮০) *দশকুমার চরিত* রচয়িতা; বাণ (খৃ: ৬২০) *হর্ষচরিত* ও *কাদম্বরী* রচয়িতা; ভামহ কাব্যশাস্ত্রের প্রাচীন আচার্যদের মধ্যে একজন।

১১. গীতটি *শবরপা* রচিত, চর্যার ২৮ সংখ্যক গীত। তৎকালীন সময়ের সাধারণ জীবনের আলেখ্য হিসাবে এখানে উদ্ধৃত হল।

১২. সরহপার ভাষার ব্যাকরণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার উদ্দেশ্য আমার নয়। আমি সংক্ষেপে ব্যাকরণের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম মাত্র। আগ্রহী পাঠক ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌র ফরাসী গবেষণা-গ্রন্থ এবং ডক্টর প্রবোধ বাগচীর *দোহাকোষ* পাঠ করে সহরপার ভাষার বিশিষ্টতা আবিষ্কার করতে সক্ষম হবেন।

দোহাকোষ

১৯০৭ সালে নেপালে গিয়ে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাপদ'এর পুঁথিটি পান। এই পুঁথির সঙ্গে তিনি সরহপার দোহাকোষটিও পান। দোহাকোষে গ্রন্থকারের নাম ছিল সররুহবজ্র। এর সঙ্গে একটি টীকা ছিল। টীকাটি সংস্কৃতে ছিল। টীকাকারের নাম অদ্বয়বজ্র। প্রাপ্ত পুঁথিগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় প্রাবণ, ১৩২৩ সালে। দোহাকোষটি যেভাবে তিনি পেয়েছিলেন সেভাবেই তিনি সংস্কৃত টীকাসহ মুদ্রণ করেন। তিনি এর বাংলা অনুবাদ দেননি এবং কোনরূপ বিশ্লেষণও দেননি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্যারিসে অবস্থানকালে এই দোহাকোষ নিয়ে প্রথম গবেষণা করেন। তিনি শাস্ত্রীর পাঠ অবলম্বন করে এবং প্যারিসে বিবলিওথেক ন্যাশিওনাল-এ প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করে পাঠ সম্পাদন করেন। পাঠ সম্পাদনার ক্ষেত্রে তিব্বতি অনুবাদ তাঁর সহায়ক হয়েছিল। শহীদুল্লাহর গবেষণা সন্দর্ভটি ১৯২৮ সালে প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়।

১৯২৯ সালে 'কল্যাণ মিত্র' ড: প্রবোধচন্দ্র বাগচী তিব্বতে অবস্থানকালে রাজগুরু হেমরাজ শর্মার ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে সরহপার দোহাকোষ সংগ্রহ করেন। পরে একই দোহাকোষের খণ্ডিত পাতা নেপালের রাজ দরবার লাইব্রেরীতে পান। তিনি দোহাকোষটি সম্পাদনা করেননি এবং এর উপর বিস্তৃত কোন আলোচনাও করেননি। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন তিব্বতে গিয়ে সরহপার সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে থাকেন। ১৯৩৪ সালে তিব্বতের ঐতিহাসিক মঠ স.স্ক্য-তে সরহপার দোহাকোষ গীতির তালপত্রে লিখিত পুঁথি পান। এই পুঁথির ওপর নির্ভর করে তিনি কয়েকবার তিব্বতে যান এবং সরহপার সমস্ত রচনাবলী আবিষ্কার করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তিব্বতী ভোট ভাষায় এর অনুবাদও পান। এ আবিষ্কারকে রাহুল সাংকৃত্যায়ন একটি মহত্বপূর্ণ ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। আমি রাহুল সাংকৃত্যায়নের পাঠকে আদর্শ পাঠ হিসেবে গ্রহণ করেছি।

ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী যে দোহাকোষ প্রকাশিত করেছিলেন সেখানে দোহার সংখ্যা ছিল ১১২। তিব্বতী ভাষায় এর যে অনুবাদ পাওয়া যায় সেখানে দোহার

সংখ্যা ১৩৫ এবং স.ক্য মঠে প্রাপ্ত তালপাতার পুঁথিতে আছে ১৬৪। সাংকৃত্যায়ন এই মঠের পুঁথি সম্পাদনা করেছেন-এর মধ্যে ৯০টি দোহা বেশী আছে। রাহুল সাংকৃত্যায়ন সম্পাদনা করতে গিয়ে দোহাগুলোকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং একেক ভাগের নামকরণও করেছেন। এই নামকরণগুলো হচ্ছেঃ (১) ষট্ দর্শন খণ্ড, (২) করুণা সহিত ভাবনা, (৩) চিত্ত, (৪) ভাবনা (৫) এই সমস্ত অর্থাৎ করুণা, চিত্ত, ভাবনা এবং ষট দর্শনের সমন্বয় (৬) সহজযান। আমি আমার আলোচনার মধ্যে এ নামকরণগুলো গ্রহণ করিনি; কেননা মূলে এগুলো নেই। সাংকৃত্যয়ন তাঁর বিভাজন অনুসারে দোহাগুলোকে একটি ক্রমে সাজিয়েছেন। আমিও এই ক্রমকে অনুসরণ করেছি।

বস্তুতঃ রাহুল সাংকৃত্যয়নের পাঠকে আমি সর্বাংশে গ্রহণ করেছি।

মূল অপভ্রংশ পাঠ

ব্রমহণেঁহি ম জানন্তহি ভেউ।
এবই পঢ়িঅউ এ ছউবেউ।।
মট্টি পাণি কুস লঈ পঢ়ন্ত।
ঘরহিঁ বইসী অগ্গি হুণন্ত।।
কজ্জে বিরহিঅ হুঅবহ হোমেঁ।
অক্খি ডহাবিঅ কড়ুয়েঁ ঘূমেঁ।।
একদণ্ডি ত্রিদণ্ডী ভঅব বেসেঁ।
বিণুআ হোইঅই হংস উএসেঁ।।

মিচ্ছেহিঁ জগ বাহিঅ ভুল্লেঁ।
ধম্মাধম্ম ণ জাণিঅ তুল্লেঁ।।
অইরিএহিঁ উদ্দূলিঅ ছ্যারেঁ।
সীসসু বাহিঅ এ জড়-ভারেঁ।।
ঘরহী বইসী দীবা জালী।
কোণহিঁ বইসী ঘন্টা চালী।।
অক্খি ণিবেসী আসণ বন্ধী।
কণ্ণেহিঁ খুসখুসাই জণ ধন্ধী।।
রণ্ডী-মুণ্ডী অন্নবি বেসেঁ।
দিক্খিজ্জই দক্খিণ-উদ্দেসেঁ।।

দীহণক্খ জই মলিণেঁ বেসেঁ।
ণগ্গল হোই উপাড়িঅ কেসেঁ।।
খবণেহিঁ জাণ বিড়ংবিঅ বেসেঁ।
অপ্পণ বাহিঅ মোক্খ উবেসেঁ।।
জই ণগগাবিঅ হোই মুত্তি, তা সুনহ সিআলহ।।
লোমুপাড়ণেঁ অত্থি সিদ্ধি, তা জুবই ণিঅম্বহ।
পিচ্ছীগহণে দিট্ঠ মোক্খ তা মোরহ চমরহ।।
উঞ্চে ভোঅণেঁ হোই জ ণ, তা করিহ তুরড়ংগহ।
সরহ ভণই খবণাণ মোক্খ, মহু কিম্পি ণ ভাবই।।
তত্ত-রহিঅ কাআ ন তাব, পর কেবল সাহই।
চেল্লু ভিক্খু জে থবির উএসেঁ।
বন্দেহিঅ পব্বজ্জিউ বেসেঁ।।

কোই সুত্তন্ত বক্‌খাণ বইট্‌ঠো।
কোবি চিত্ত করূঅ মই দিট্‌ঠো।
অণু তহি মহাজাণে ধাবিউ।
মণ্ডল চক্ক মবি নাধেউ।।
তসু পরি আণেঁ অণ্ণ ন কোঈ।
অবরে গঅণে সজ্‌জই সোঈ।।
সহজ ছাড়ী ণিব্বাণেহিঁ ধাবিউ।
ণউ পরমত্থ একবি সাহিউ।।
জো জসু জেণ হোই সন্তুট্‌ঠ।
মোক্‌খ কি লব্‌ভই ঝাণ-পবিট্‌ঠ।।
কিন্তহ দীপে কিন্তহ ণেবেজ্জে।
কিন্তুহ কিজ্‌জই মন্তহ ভাবেঁ।।
কিন্তুহি ন্তিত্থ তপোবণ জাই।
মোক্‌খ কি লব্‌ভই পাণী ন্‌হাই।।
ছড়্‌ড়হু রে আলীকা বন্ধা।
সো মুঙচহু জো অচ্ছহু ধন্ধা।।
তসু পরিআণহু অণ্ণ ণ্ণ কোবি।
অবরে গাণ্ণে সব্বই সোবি।।
সোবি পটিজ্জই সোবি গুণিজ্জই।
সত্থ-পুরাণে বক্‌খাণিজ্জই।।
নাহি সো দিট্‌ঠি জো তাউ ণ লক্‌খই।
এত্তবি বরগুরূপাআ পেক্‌খই।।
জই গুরূ-বুত্ত হো হিঅহি পঈসই।
ণিচ্চিঅ হত্থে ঠবি অউ দীসই।।
সরহ ভণই জগ-বাহিঅ আলেঁ।
ণিঅ সহাব ণ লক্‌খিঅ বালেঁ।।

করুণ-রহিঅ জ্জো সুণ্ণহিঁ লগ্‌গা।
ণউ সো পাবই উত্তিম মগ্‌গা।।
অহবা করুণা কেবল সাহঅ।
সো জঁনমন্তরেঁ মোক্‌খ ণ পাবঅ।।
জই পুণ বেণ্ণবি জোড়ণ সাক্কঅ।
ণউ ভব ণউ ণিব্বাণেঁ থাক্কঅ।।
ঝাণ-হীণ পব্বজ্জেঁ রহিঅউ।
গহী বসন্তেঁ ভাজ্জেঁ সহিঅউ।।
জই ভিডি বিসঅ রমন্তে ণ মুচ্চঅ।

সরহ ভণই পরিআণ কি রুচ্চঅ।।
জই পচ্চক্খ কি ঝাণে কীঅই।
অহবা ঝাণ অন্ধার সাধিঅঅ।।
সরহ ভণই মই কড়ঢ়িঅ রাব।
সহজ সহাউ ণউ ভাবাভাব।।
জা ল্লই উবজ্জই তা ল্লই বাজ্জই।
তা লই পরমমহাসুহ সিজ্জই।।
সরহ ভণই মহু কি ক্করমি।
পসু লোঅ ণ বুজ্জই কী করমি।।
এক্কেন সাঙচিঅ ধণঅ পউরু, অবরে নিদিণ্ণ সআই।।
কাল গচ্ছন্তেঁ বেণ্নি গউ, ভণতো ভণ্নো কাই।।
পাণি চলণি রঅ গই, জীব দরে ণ সগ্গু।
বেণ্নবি পন্থা কহিঅ মই, জহিঁ জাণসি তহিঁ লগ্গু।।

চিত্তেক চিত্ত সঅল বীঅ ভব-ণিববাণা জন্ম বিফুরন্তি।
তঁ চিন্তামণিরূঅঁ পণমহ ইচ্ছাফলন্দেই।।
বজ্ঝই কম্মেণ জণো কম্ম বিমুক্কেণ হোই মণমুককো।
মণমোক্খেণ অণুঅরণ পাবিজ্জই পরম ণিব্বাণঁ।।
আক্খর বাড়া সঅল জগু, নাহি ণিরক্খর কোই।
তাব সে অক্খর ঘোলিঅই, জাব ণিরক্খর হোই।।
বন্ধো ধাবই দস দিসহিঁ, ম্মুক্কো ণিচ্চল ট্ঠাঅ।
এমই করহা পেক্খ সহি, বিবরিঅ মহু পডিহাঅ।।
চিত্তহ মূল ণ লক্খিঅই, সহজেঁ তিণ্নবি তত্থ।
কহিঁ উঅজ্জঅ বিলঅ জাঅ, কহিঁ বসঅ ফুড় এথু।।
মূল-রহিঅ জো চিত্তই তাত্ত।
গুরু-আএসহ এত্ত রিআত্ত।।
সরহ ভণই ণিউণত্তণেঁ জাণহু।
এব্বহিঁ পরম মহাসুহ মাণহু।।

ইন্দী জখ বিলীঅ গউ, ণট্ঠো অপ্প সহাব।
সো হলেঁ সহজানন্দ তণু, ফুড় পুচ্ছহ গুরূপাব।।
জহি ম্মণ মরই, পবণহো তহি খঅ জাই।
এহু সো পরমহাসুহ, সরহ কহিহউ জাই।।
জহিঁ ইচ্ছই তহি জাউ মণ, অহবা নিচ্চল ট্ঠাই।
অদ্ধুগ্ঘাটী লোঅণেঁ, দিট্ঠী বিসামে কোই।।
জই উআঅ উআএঁ ধাহঅ।

অহবা করুণা কেবল সাহঅ।।
জই পুণু বেণ্নিবি জোড়ণ সক্কঅ।
তব্বেঁ ভব-ণিব্বাণহি মুক্কঅ।।
পঢমেঁ জই আআস বিসুদ্ধ।
চাহন্তেঁ চাহন্তেঁ দিট্ঠি ণিরুদ্ধ।।
ঐসে জহ্ আআস বি কালো।
ণিঅ মণ দোসেঁ ণ বাজই বালো।।
অহিমাণ দোসেঁ ণ লকখিঅ তাত্ত।
দূসই সঅল জাণ সো দেত্ত।।
জ্ঞাণেঁ মোহিঅ সঅলবি লোঅ।
ণিঅ সহাব ন লক্খিঅ কোবি।।
চন্দ-সুজ্জ ঘসি ঘালই ঘোট্টই।
সো আণুত্তর এথু পঅট্ঠই।।
এব্বহিঁ সঅল জাণ ণিগূঢ়ো।
সহজ সহাবে ণ জাণিঅ মূঢ়ো।।
ণিঅ মণ সাক্ষেঁ সোহিঅ জব্বেঁ।
গুরু-গুণ হিঅহি স্পইসই তব্বেঁ।।
এব মুণেবি ণু সরহেঁ গাইব।
মন্ত ণ তন্ত ণ এক্কবি গাহিব।।
সো গুণ-হীণো অহবা ণিরক্খর।
সিরিগুরুপাএ নিদিণ্ণু মো বাক্খর।।
তসু চাহেন্তেঁউ হমি ণ দীস।
সরূঅ চাহেন্তেঁউ হমি ণ কীস।।
সঅলহি তত্তসার সো বুচ্চঅ।
সরহ ভণই মহুঁ সোবি ণ রুচ্চঅ।

জই পুণু অহ- ণিসি সহজ পইট্ঠই।
অমণাগমণ জেঁ তহি ণেবাট্টই।।
ভাবাভাবেঁ বেণ্নি ন কাজ্জ।
অন্তরাল ট্ঠিঅ পাড়হু বাজ্জ।
বিবিহ পআরেঁ চিত্তবি অপিব।
সোবি চিত্ত ণ কেণবি অপিব।
ইন্দী বিসঅ উ অসংট্ঠাউ, সএঁ সম্বিত্তিএ জথা।
ণিঅ চিত্তন্তেন কাল গউ, জ্ঞাণ মহাসুহ তথ।।
পন্ত মুসারিউ মসি মিলিউ, হোবি লিহে না খীণু।
জাণিউ তেঁ বিস পরমপউ, কহি অই কহি লীএণু।।

ঝাণ-রহিঅ কি কীঅই জ্ঞাণেঁ
জো অবাচ্চ তহিঁ কিঅ বক্খাণে।।
ভুঅ মুদ্দে সঅল জগ বাহিউ।
ণিঅ সহাব ণ কেণবি ণাহিউ।।
মন্ত ণ তন্ত ণ ধেঅ ণ ধারণ।
সব্ববি রে বঢ় বিব্ভম-কারণ।।
অসমল চীঅ ম জ্ঞাণেঁ খরড়হ।
সুহ অচ্ছন্তেঁ ম অপ্পণ জ্ঞগড়হ।।
গুরু-বঅণ-আমিঅ-রস, ধবহিঁ ণ পিবিঅউ জহিঁ
বহু সাথ্থ-মরুত্থলিহিঁ, তিসিঅ মরিব্বো তেহিঁ।
মণ নিম্মল সহজাবত্থে গউ, অরিউল নাহিঁ প্পবেস
এ তেঁ চীত্রহু ফুড সথাবিঅউ, সো জিণ নাহিঁ বিসেস
জিম লোণ বিলিজ্জই পাণিএহিঁ, তিম জই চিত্তবি টঠ্ঠই
অপ্পা দীসই পরহিঁ সম, তথ্থ সমাহিএ কাই।।
জোবই চিত্ত ণ আণই বম্হা।
অবর কো বিজ্জই পুচ্ছই অম্হা।
ণামেহিঁ সণ্ণ অ-সণ্ণ পআরা।
পুণু পরমত্থেঁ একাআরা।।
খাঅন্তেঁ জীবন্তেঁ সুরঅ রমন্তে।
আলি-উল বহলহো চক্কো ফরন্তে।।
এবহি সিদ্ধি জাই পরলোঅহ
মাথে পাও দেই ভুঅলোঅহ।।

জহি মণ পবণ ণ সন্চরই, রবি-সসি ণাহিঁ পবেস।।
তহিঁ বঢ় চিত্ত বিসাম করু, সরহেঁ কহিঅ উএস।।
এক্ক করু মা বেণ্নি করু, মা করু বিণ্নি বিসেস।
এক্কেঁ রংগে রঙ্জিআ, তিহুঅণ সঅলাসেস।।
আই ণ অন্ত ণ মজঝ তহিঁ, ণউ ভব ণউ ণিব্বাণ।
এহু সো পরমমহাসুহ, ণউ পর ণউ অপ্পাণ।।
অগ্গেঁ পচ্ছেঁ দস দিসেঁ, জঁ জঁ জোঅমি সোবি।
ঐব্বেঁ তু দীঠন্ত ডী, ণাহ্ ণ পুচ্ছমি কোবি।।
বাহরেঁ সাদ কো দেই, অভিন্তরে কো আলবই।
সান্ধহ সান্ধ কো মেলবই, কো আণেই কো লেই।।
অপ্পা পরহিঁ ণ মেলবিউ, গমণাগমণ ণ ভাগ্গ।
তুস কুট্টন্তে কাল গউ, চাউল হত্থ ণ লাগ্গ।।

রবি সসি বেণ্ণবি মা কর ভান্তী।
বম্হা-বিট্ঠু মহেসর ভান্তী।।
গাঢালিডংগমাণ সো রাজ্জ বরু, জগ উপ্পজ্জই তথু।।
অরে পুত্ত তোজ্জ্ঞ তত্ত, রসু সুসংট্ঠিউ ভোজ্জ।
বক্খাণন্ত পঢন্তানিঅ, জগহিঁ ণিআ- ণিঅ সোজ্জ্ঞ।।
অধ-উদ্ধ মাগ্গবরেঁ পইসরেই।
চন্দ-সুজ্জ বেই পডিহরেই।।
বঙ্চিজ্জই কালহুতণঅ গই।
বে বিআর সমরস করেই।।
কো পত্তিজ্জই কসু কহমি, অজ্জউ কিঅউ অরাউ।
পিঅ-দন্সণেঁ হলে ণট্ঠ ণিসি সংজঝাসেঁ হুউ জাউ।।

সুণ্ণবি অপ্পা সুণ্ণ জগু, ঘরে-ঘরেঁ এহু অক্খাণ।
তরুঅর মূল ণ-জাণিআ, সরহে হিঁ কিঅ বক্খাণ।
জই রসাঅলু পইসরহু, অহ দুগ্গমহু আআস।
ভিন্নাআর মুণ তুহ, কহ মোক্খ-হব্বাস।।
বুদ্ধি বিণাসই মণ মরই, তুট্টই জহিঁ অহিমাণ।
সো মাআমঅ পরমপউ, তহিঁ কি বজ্জই জ্ঞাণ।।
ভব উএক্খই খএহি নিবজ্জই।
ভাব-রহিঅ পুণু কহিঁ উঅজ্জই।।
বেই-বিবজ্জিঅ জো উঅজ্জই।
অচ্ছহু সিরিগুরুণাহেঁ কহিজ্জই।।

দেক্খউ সুণউ পঈসউ সাদ্দউ।
জিঘ্ঘউ ভমউ বঈসউ উট্ঠউ।।
আলমাল ববহারেঁ বোল্লউ।
মণ ছড়ু একাআরে ম্ম চলউ।।
চিত্তাচিত্ত বি পরিহরহু, তিম অচ্ছহু জিম বাল।
গুরু-বঅণেঁ দিঢ ভত্তি করু, হোইহই সহজ উল্লাল।।
অক্খরবাণী পরমগুণেঁ রহিঅউ।
ভণই ণঁ জাই সো মই কহিঅউ।।
সো পরমেসর কাসু কহিজ্জই।
সুরঅ কুমারী জিম উঅজ্জই।।

ভাবাভাবেঁ জো পরিছিণ্ণউ।
তহিঁ জগ তিঅ সহাব বিলীণউ।।
জব্বেঁ তহি মণ ণিচ্চল থাক্কই।

তব্বেঁ ভব-ণিব্বাণেহি মুক্কই।।
জাব ণ অপ্পউ পর পরিআণসি।
তাব কি দেহাপুত্তর পাবসি।।
এমই কহিউ ভান্তি ণ ভাবা।
অপ্পউ অপ্পা বুজ্জহি তাবা।।
অণু-পরমাণু ণ রূঅ বিচিত্তউ।
অণবর ভাবহু ফুরই সরইউ।।
সরহ ভণই ভিড়ি এত্তবি মান্তউ।
অরে ণিকোল্লী বুজ্ঝহু মিত্তউ।।
আগ্গে আচ্ছঅ বাহিরে আচ্ছঅ।
পই দেক্খঅ পউবেসী পুচ্ছঅ।।
সরহ ভণই বঢ় জাণহু অপ্পা।
ণউ সো ধেস ণ ধারণ জাপা।।
জই গুরু কহই সব্ব বি জাণী।
মোক্খ কি চ্ছড়ই অপ্পণু বাণী।।
দেস ভমই হাব্বাসে লইউ।
সহজ ণ বুজ্ঝই পাবেঁ গহিউ।।
বিসঅ রমন্তে ণ বিসঅহিঁ লিপ্পই।
উঅল হরন্তেঁ ণ পাণী চ্ছপ্পই।।
এমই জোই মূল সগত্তো।
বিসঅ ণ বাজ্জই বিসঅ রমন্তো।।

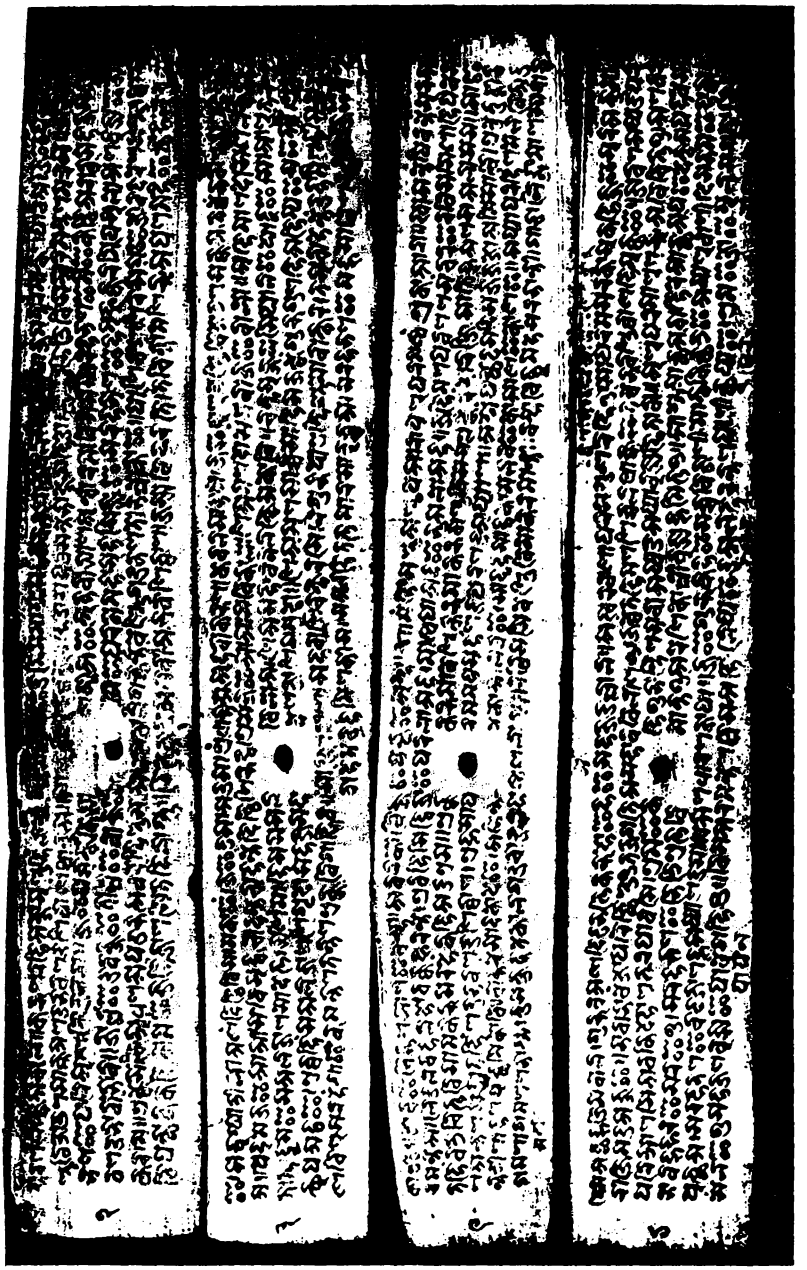
দেব পুদিজ্জঅ লক্খবি দিজ্জঅ।
অপ্পউ মারী কীস করিজ্জঅ।।
তহবি ণ তুট্টই এহু সংসারূ।
দিবণু আভাসেঁ ণাহি নিসারূ।।
ভাবাভাবহ ভাবণুরত্তো।
পসুঅ মজ্জ্জে তে গণিঅন্তি সত্তো।।
জ্ঞানে জা কিঅ মোক্খাবাস।
সো ভব-রাক্খসকেরো দাস।।
ধরিঅউ হংস মই কহিঅউ ভেঅ।
অধ-উদ্ধ দুই পক্খাঁ ছেঅ।।
পক্খবিহুণ্নে কহবি জাঅ।
দেহ মূঢ় জই ণিচ্চল ট্ঠাঅ।।

পণ্ডিঅ সঅল সত্থ বক্খাণঅ।
দেহহিঁ বুদ্ধ বসন্ত ণ জাণঅ।।
অমণাগমণ ণ এক্ক বি খণ্ডিঅ।
তউ ণিলজ্জ ভণই হঁউ পণ্ডিঅ।।

জত্তই চিত্তহু বিফুরই, তত্তই ণাহু সরুঅ।
অণ্ণ তরংগ কি অণ্ণ জলু, ভব-সম খ-সম সরুঅ।।
ণ তুঁ বাএঁ গুরু কহই, ণউ তঁ বুজ্ঝই সীস।
সহজ সহাবা হলেঁ অমিঅরস, কাসু কহিজ্জই কীস।।
জন্তই পইসই জলেঁহি জলু, তত্তই সমরসু হোই।।
দোসগুণাঅর চিত্ততা, বড় পড়িবক্খ ণ হোই।।
ছড়ড়ই জে সহজে সহজ বুদ্ধি-এ লইউ।
বিবিহ পআর পবঙ্চা সহিউ।।
এক্ক কহবি ণ কীঅঈ বাসণ।
এহু আণত্ত সঅল জিণ-সাসণ।।
মুককাবথি জে সঅল জণ্ড, ণাহি ণিবদ্ধো কোবি।
মূঢহি মোই পমত্তিঅই, সত্থাবত্থ জে সোবি।।
চিত্তহ পসর ণিরন্তর দেক্খী।
লোহ মোহ জে কহিউ উএক্খী।।
জক্খ-রূঅ জিম চিত্তএর বিভাঅ।
মায়াজাল জে তিম পড়িহাঅ।।
সঅলহো এহু সাহাঙ্চিঅ দেক্খহু।
তহিম্বি লীণ চিত্ত উএক্খহু।।
সহজেঁ সহজ বি বুজঝই জব্বেঁ!
অন্তরাল গই তুট্টই তব্বেঁ।।
রিদ্ধি-সিদ্ধি হলেঁ বেণ্নি ন কাজ্জ।
পাপ-পুণ্ন তহিঁ পাউহু বাজ্জ।।
সো আনুত্তর বুজ্ঝহি জব্বেঁ।
সরহ ভণই জগ সিজঝই তব্বেঁ।।
হরি-হর-বুদ্ধ এহুবি কাম্ম।।
গুরুঅ বঅন সংসিদ্ধউ জব্বেঁ
ইন্দিআল সব্ব তুউই তব্বেঁ।।
সরহ ভণই অনুত্তর ধাম্ম।
সব্বাআরবরোত্তম কোবি।

সুণহ সিআল ব সত্তু লেঁ সোবি।।
সুদ্ধিএ জাণিঅ জব্বেঁ।
জিণ-গুণ-রঅণ পাবিঅ তব্বেঁ।।
অহবা মোহে সো পরিআণিউ।
মোক্খহ বুদ্ধিএ জাই সম্মাণিঅউ।।
হত্থহি কংকণ ট্ঠিঅউ ণ্নাই।
গুণ-দোস-বিঅক্খণ দপ্পণহিঁ ণ জাণই।।
বদ্ধহ সঅল মণে দেই মুক্কা মল্ল মাণ সো বাজ্ঝই।
জাণহ পরমাথ ণ অথা ছিণ্ণঁ সব্বোচ্ছিণ্ণঁ পেচ্ছহ সব্বঁ
সা হোহ সুব্বোচ্ছিত্রঁ অব্বোচ্ছিত্রঁ মুন আণন্তণ।।
স এসংবিত্তি মা করহু রে ধান্ধা।
ভাবাভাব সুগতি রেঁ বান্ধা।
ণিঅ মণ মণহু রে ণেহুএঁ জোই।
জিম জল জলেহি মিলন্তে সোই।।
জ্ঞাণ মোক্খ কি চাহু রে আলেঁ।
মাআজাল কি চাহু রে কোলেঁ।।
বরগুরুবঅণ পত্তিজই সাচ্চেঁ।
সরহ ভণই মই কহিঅউ বাচ্চেঁ।।
ণিঅ সহাব ণ লদ্ধঅ বঅণেঁ।
দীসই গুরু-আ-এসে ণঅণেঁ।।
ণউ তসু দোস জে এক্কবি ট্ঠাঅ।
ধম্মাধম্ম জে মোহী খাঅ।।
চিত্তে বদ্ধে বজ্ঝই মুক্কে মুক্কই ণত্থি সন্দেহো।
বজ্ঝন্তি জেণ জড়া পরিমুঙ্চন্তি তেণ বুধা।।
বদধো গমই দস দিসেহি, মুক্কো ণিচ্চল ট্ঠাঅ।
এমইকরহা ঐক্খু সহি, বিবরিঅ মহু পড়িহাই।।

পবণ ধরি অপ্পাণ ম ভিন্দহ।
কট্ঠ-জোঅ নাসাগ্গ ম বিন্দহ।।
অরে বঢ সহজ গই পর রজ্জহ।
মা ভব-গন্ধ-বন্ধ পড়িবজ্জহ।।
এহু নিঅ মণ সবল চাতর স চল।
মেলহিঁ সহাব ট্ঠাঅ বসই দোস-ণিম্মল।
জব্বেঁ মণ অথমণু জাই, তণু তুট্টই বন্ধণ।
তব্বেঁ সম রসহি মজ্ঝে, ণউ সুদ্দ ণ বাম্হণ।।



দোহাকোষের পাণ্ডুলিপির পাতা



সরহপা

এথু সে সরসই সোবণাহ, এথু সে গংগাসাঅরু।
বারাণসি পআগ এথু, সে চান্দ-দিবাঅরু।।
খেত্ত পিট্ঠ উঅপিট্ঠ, এথু মই ভমিঅ সমিট্ঠউ।
দেহাসরিস তিত্থ, মই সুণউ ণ দিট্ঠউ।।
সরু পুড়অণি দলু কমল, গন্ধ-কেসর বর ণালেঁ।
ছাড়হু বেণ্ণিমা করহু সে, মা লাগ্গহু বঢ় আলেঁ।।
কামান্ত সান্ত খঅ জাঅ, এত্থ পুজ্জহু কুলহীণউ।
বাম্হ-বিট্ঠু-তইলোঅ, জহিঁ জাই বিলীণউ।।
জই ণউ বিসঅহিঁ লীলিঅই, তহু বুদ্ধন্ত ণ কেহিঁ।
সেউ-রহিঅ ণব অংকুরহিঁ তরুসম্পত্তি ণ জাউ।
জত্থবি তত্থবি জহবি তহবি, জেণ তেণ হুঅ বুদ্ধ।
সএ সংকপ্পে নাসিঅউ, জগু সহাবহি সুদ্ধ।।
সহজ কপ্প পরে বেবি ঠিউ, সহজ লেউ রে সুদ্ধ।
কঅপঅপাণী পীস লউ, রাঅহন্স জিম দুট্ঠ।।

জগ অপপাঅণে দুক্খ বহু উপ্পণ্ণউ তহিঁ সুঅসার।
উপ্পণ উপ্পাঅ ণহিঁ, লোঅ ণ জাণই সার।।
অরে পুত্ত তত্ত বিচিত্ত রসু, কহন ণ সক্কই বত্তু।
কপ্প-রহিঅ সুহ টঠাণ কুহ।
ণিঅ সহাবেঁ সেবিউ এক্কহ।।
কমণে সো গুণহি ধরিঅউ।
অহবা একোবি ণ ধরিঅউ।।
সুণ্ণাসুণ্ণ বি বুজঝই জত্থু।
গুরু পুণউ বণ্ণ বি ভুনজই তত্থু।।
বুদ্ধ বি বঅণেঁ এত্থবি ধম্ম।
লোআচারেঁ এত্থবি কম্ম।।
সঅল তত্ত সহাবেঁ দেক্খহ।
লোআচার জে তহিঁ উএক্খহ।।
এবহিঁ বুদ্ধ- রূঅ হলেঁ কোবি।
সহজ সহাবেঁ সিজঝই সোবি।।
সুঅণে জিম বরকামিণি মাণিউ।
রই-সুহ তহিঁ পচ্চক্খহিঁ সমাণিউ।।
এবহিঁ বুদ্ধ-রূঅহু লউ সিজঝই।
পজ্জোপাএঁ কহবি ণ বজ্ঝই।।
জই মণ সহজ ণিরন্তরেঁ পাবই।
ইন্দী বিসঅহি খণবি ণ ধাবই।।

তহিঁ সো বি দেঅ এ চউরিদ্ধী।
সরহ ভণই জিণ-বিম্ব বি সিদ্ধী।।
দোহা সংগম মই কহিঅউ, জেহু বিবুজ্ঝিঅ তত্থ।
এহু সংসার হলেঁ লেহু, জহিঁ জাণিজ্জই তত্থ।।
গহি গুণ ধম্ম সংসার অহবা সত্থত্থ ণিঅত্থণেঁ।
তহি ভাসিঅ দোহাকোসঁ তত্থ ছিঁঅকন্ধএঁ সমত্তঁ।।
জই কহমি তোজঝু কহণ ণ জাই।
অহবা কহমি জণকের মণপত্তঅ ণ জাই।।
জই পমাএঁ বিহি বসেঁ, বঢ় লদ্ধউ ভেউ।
জই চণ্ডাল-ঘরেঁ ভুঙ্জই, তঅবি ণ লাগই লেউ
সহজ-সহজ মু মাণহু আলেঁ।
জে পুণু বন্ধ হোই ভবপাসেঁ।।
অরে বঢ় আসা কহবি ণ কাজ্জ।
দস সদ গুরু কিরণে পাড়হু বাজ্জ।।

সঅ-সংবেঅণ তত্ত বঢ়, লোএঁ তেঁ কাই মণন্তি।।
জো মণ গোঅরেঁ পাবিঅই, সো পরমত্থ ণ হোন্তি।।
ণিঅ সহাব গঅণ সম, অপ্পা পর ণউ সোই।
সহজাণন্দ চউট্ঠউ, সো কী বুচ্চ ণ জাই।
বিণ বজ্জে জিম ছান্তী জাবতিঅ, মণ মাআকের সহাব।
সঅল বিসঅ ণ সহাবেঁ সিজঝঅ।
পজ্জোপাএঁ কহবি ণ বাজঝঅ।।
জিণবর-বঅণেঁ পত্তিজ্জহু সাচ্চেঁ।
সরহ ভণই মই কহিঅউ বাচ্চেঁ।।
সহজেঁ সহজ বি বাহিঅ জবেঁ।
অচিন্ত জোএঁ সিজঝই তবেঁ।।
জিম জল সজঝে চন্দডা, ণউ সো সাচ্চ ণ মিচ্ছ।
তিম সো মণ্ডলচক্কড়া, ণউ হেডউ ণউ খিত্ত।।

চিত্ত দেব জে সঅলহি রাজ্জই।
পর-চিত্তন্ত চাউলি ভুনজই।।
চিত্তহিঁ সঅল জগ জো দীসঅ।
সহজ সহাবেঁ কিম্পি ণ দীসঅ।।
চিত্তহিঁ চিত্ত জই লক্খণ জাই।
চঞ্চল মণ পবণ থির হোই।।
চিত্ত থির জো ণিম্মল ভাব।

তহিঁ ণ পইসই ভাবাভাব ।।
এহু দেব বহু আগম দীসঅ।
অপ্পণ ইচ্ছেঁ ফুড় পড়িহাসঅ।।
অপ্পণু ণাহো পর বিরুদ্ধো।
ঘরে ঘরে সো সিদ্ধান্ত পসিদ্ধো।।
হিঅহিঁ কাচ মণি লই তুটঠো।
বোহিমণ্ডল মহাসুহ ণ পইটঠো।।
সম্বর চিত্ত-রাঅ দিঢ চাংগো।
জাব ণ দংসঅ বিসঅ ভুজংগো।
পঞ্জরে জিম পগি পক্খি নিচঙ্চল।
তিম মণ রাউ লগই সুঠু বঙচল।।
সো জই লইঅই অইন্ত বিরালেঁ।
চলই ণ বুল্লই ট্ঠিঅই নিরালেঁ।।
চিন্তাচিন্ত ণ কিঅউ মই, ণউ পরিআণিঅ কীস।
বুজঝহো জো গুণবন্তো, বেণ্নি করিআ সীস।
জই ট্ঠাণ ণ ঘেপ্পই দুট্ঠ মণু, ইন্দী কাই চরেই।
পসুঘরেঁ চোরহ মন্ত ণ পেচ্ছই, জো তইলোঅ হরেই।।
চ্ছাআচ্ছাআহিঁ জই সো পইট্ঠো।
দেহ বসন্তো চিত্ত ণ দিট্ঠো।।
জো সো জাণই নিঅ মণ ট্ঠাণা।
সঅল জগ ভবতি ভব সুইণা।।
নিব্বাণেঁ টঠিঅ ঝাণে রাজই।
আণ্ন মান্দ আণ্ন আউ সহ কীজই।।
ণউ সো ঝাণেঁ ণউ পব্বাজেঁ।
গেহ বসঁন্তে সমরস ভাজ্জেঁ।।
ঘরে ঘরে কহিঅঅ সোজঝু কহাণো।
ণউ পরিআণিঅ মহাসুহ ট্ঠাণো।।
সরহ ভণই জগ চিত্তেঁ বাহিউ।
সোবি অচিন্ত ণ কেণপবি গাহিউ।।

এ জে করুণ মুণন্তী মাগহি, দিঢ লাগই তেঁ ভব-পাস।
অই অণ্ণো সো অণক্খরু ণব, সুণ্নহিঁ চিত্ত নিরাস।।
জিম জলেহিঁ সসি দিসই চ্ছাআ।
তিম ভব পড়িহাসই সঅলবি মাআ।।
অইসো চিত্ত ভমন্তে ণ দিঠ্ঠো।
ভব ণিব্বাণ ণিরন্তরেঁ পইট্ঠো।।

অন্তো ণত্থ সুইউআ ণট্ঠো কাল দুইউ।
একো বি সো জাণিব্বো জেণ কম্মসউ।।
নিজ্জিঅ সাসো ণিহন্দ- লোঅণো সঅল বিআর বিমুক্কো মণো।।
জো এ আবত্থ গউ সো জোই ণত্থি সন্দেহো।
নিট্ঠুর সুরঅ সঁ পাণিঅ, কমল-কুলিস সম্পত্তি।
খণে খণে কিঁ বিবোহিঅ ণিব্বাণ সএসম্বিত্তি।
বেবি কোডি ণ রত্তো, কহি ম্পুণ লক্খ কহাণ।।
তহ বেবি রহিঅ ণিউগো, অনুত্তর বোহি বিণ্ণাণ।।
রসু পরিভুঙ্জ ণ মূল-রস, কমলবণেঁ পণ মজ্জই।
বহু সন্তাবেঁ সঅলেঁ, চিত্ত-গ এন্দ ণ রজ্জই।।
আলঅতরু উমলই, হিণ্ডই জগ ছ্হাছ্হান্দ।
গম্মাগম্ম ণ জাণই, মত্তো চিত্ত-গঅন্দ।।
জই জগ পূরিঅ সহজানন্দে।
ণাচ্চহু গাঅহু বিলসহু চডংগে।
জই পুণু ঘেপ্পহু বাসণ বিন্দে।
তহ ফুড বাজঝহু এ ভব-ফান্দে।।
সমতা কামিণি অণুহ ণিবাস।
সমরস ভোঅণ অম্বর বাস।।
তহি পুণু কিম্পি ণ দীসই আন্তর।
সম গউ চিত্তরাঅ নিরন্তর।।

সুণ্ণ নিরঙ্জণ পরম পউ, সুইণোমাঅ সহাব।
ভাবহু-চিত্ত সহাবতা, জউ ণাসিজ্জই জাব।।
রবি-সসি বন্ধণ গউ জব্বেঁ।
উঅরে অরই তলেঁ খরই ণ তব্বেঁ।
দেক্খই রবি পরি ত বুদ্ধ বিণ্ণাণা।
উঅরে অরই তলেঁ ণাহি মোক্খরণা।।
ণউভব ণউ নিব্বাণে দিট্ঠিঅউ, মহাসুহ বাজ্জ।
জো ভাবই মণু ভাবণে, সো পর সাহই কাজ্জ।।
অক্খর-বণ্ণ-বিবজ্জিঅ, ণউ সো বিন্দু ণ চিত্ত।
এহু সো পরমমহাসুহ, ণউ ফেডিঅ ণউ খিত্ত।।
জিম পডিমিম্ব-সহাবতা, তিম ভাবিজ্জই ভাব।
সুণ্ণ নিরঙ্জণ পরমপউ, ণ তহিঁ পুণ্ণ ণউ পাব।।
পঙ্চ কামগুণ ভোঅণেহিঁ, ণিচিন্ত থিয়েহিঁ।

এব্বেঁ লবভণ পরমপউ, কিম্বহু বোল্লিঅ এহিঁ।।
হউঁ পুণু জাণমি জেণ মণু, ছাড়ই চিন্তা-তাত্ত।
জো দুজ্জঅ পড়িঅ মণু, ণউ সো বুজ্জই তাত্ত।।

ধেঅ ণ ধারণ মন্ত তহিঁ, ণউ তহিঁ সিব অসত্তি।
লক্খালক্খ বিণাহ্নি স্তেহিঁ, ণউ তহিঁ ভাব-পসত্তি।।
নউ তহিঁ ণিন্দা ণউ সিবিণ, ণউ জাগর সুসুত্ত।
ভাবাভাব ণিবন্দণু, ণউ তহিঁ থাক্কঅ চিত্ত।।
ণউ জাইঅই ণউ সরই, ণউ অবিত্থিণ্ণ বি-হোই।
ণউ করাবই ণউ করই, হেউ বিআরহু তোবি।।

জসু আই ণ আন্ত, ণউ জাণিঅ মজঝ।
তসু কহি কিজ্জই কহসু মই, জোইহিঁ পুজ্জা কজ্জ।
বণ্ণ-আআর পবাণ-রহিঅ, অক্খুরু বেউ অণন্ত।
কো পুজ্জই কহ পুজ্জিঅই, জাসু আই ণ অন্ত।
সহি সংসরহ কহিঁ তুহু, এত্থ কহিজ্জই তত্ত।
ণউণ বিআর করন্তহিঁ, ণউ কত্থবি পরমাথ।।
জিম কেলতরু সোহণেহি, ণউ পাবিজ্জই সারু।
তিম ভুঅ তত্ত বিআরণেঁ, দীসই এহু সংসারু।।
বন্দ ণ দীসই এথু হলেঁ, ণউ সো মোক্খ সহাব।
বুদ্ধ সংয়োগ পরমপউ, এহু সে মোক্খ-সহাব।।
জেণ পসবই হিঅঅ পজ্জোর, তেণ কিসেবি এণ।
সগুণ পইসই তিঅস জণু, ভাবই চিত্ত মণেণ।।
নিপুংখো বাণো বাণবাসো এত্থ কারণেঁ, কিম্পি ণ জাণো অণুসরই।
সুণ্নহি মজ্ঝে সুণ্ন পউ, তহি সন্ধাণ পইসরই।।

সব্ব ধম্ম জে খসম করীহসি।
খসম সহাবেঁ চীঅ ট্ঠবীহসি।।
সোবি চীঅ অচীঅ করীহসি।
এবহি সো অণুত্তর গমীহসি।।
ণঅণ দুহহু অনুপম ণিবন্ধহ।
ণিঅ গই ণিঅ মণে জই ভিড়ি বন্ধহ।
সরহ ভণই এহ দুই পাবহু।
তুরিঅ দুক্খ মিচ্ছু ণিবারহু।।
এহু ঘরেঁ টঠিঅ মহিলা মণুসা।
এহু ণ দীসই ভণ সহি কইসা।।

পাসেঁ পাস ভমন্তে অচ্ছহ।
সরহ ভণঅ তসু ঘরিণী পেচ্ছঅ।।
সাডংকে খাদ্ধউ সঅল জগু, সডংকা ণ কেণবি খাদ্ধ।
জে সডংকা সডংকিঅউ, সো পরমত্থ বি লদ্ধ।।
মল্ল আদি উঅত্তি কম্ম, জো ভাবই উঅত্তি।
সো ণব ধম্মিঅ বপ্পড়ো, চ্ছাডহু অলিআ তত্তি।।
মরণ মরন্ত পবণ তল্লুয়ে গঅউ, তিহুঅণে সহল সমাউ।
মণ-তণেঁ জো পড়িহাসই।
সরহ ভণই সো তত্ত ণ গবেসই।।
তেল্ল-খিচ্চড়ই অক্খর সারা।
ভব-ণিব্বাণ কিম্পি ণ দূরা।।
সংসার অণুপলম্ভ ণিব্বাণ।
এহু বোহ ণ ধেঅ ণ ধারণ।।
অ-দসণ দসণ জত্তিবি তাণ।
তেত্তিবি মাত্তম ভব-ণিব্বাণ।।
অ-মুসিআরহ তন্তেঁ কাল।
এহু উএস ণ জাণই বাল।।
গুঙ্জা-রঅণ মজঝে দীপ উজাল।
চঙ্চল থির করি পবণ ণিবার।।
জো বঢ মূলহ সার বি জাণই।
তা কী কাল-বিকাল বিলাগ্গঅ।।
ণাদহ বিন্দুহ অন্তরে জো, জাণই তিস তিস ভেঅ।
সো পরমেসর পরমগুরু, উত্তারই তইলোঅ।।

বাংলায় ভাবানুসরণ

ব্রাহ্মণ কোন ভেদ বা রহস্য না জেনেই বৃথাই চর্তুবেদ পাঠ করছে। মাটি, পানি, এবং কুশ গ্রহণ করে তা পাঠ করেন এবং ঘরে বসে অগ্নি জ্বালিয়ে হোম করেন। বৃথাই তারা পূজোপচার আনয়ন করেন, তিক্ত ধোঁয়ায় চক্ষুকে পীড়িত করেন। একদণ্ডী অথবা ত্রিদণ্ডী নিয়ে সাধুর পোশাকে তাদেরকে হংসের মতো জ্ঞানী মনে হয়। বৃথাই লোকেরা তাদের ছদ্মবেশে প্রতারিত হয়। কেননা ধর্ম অধর্মের ভেদাভেদ তারা জ্ঞাত নন। শৈব সাধু সারা গায়ে ছাই মাখেন এবং মাথায় চুলের জটা রাখেন। গৃহে বসে তারা দীবা বা প্রদীপ জালান এবং এক কোণায় বসে তারা ঘন্টা বাজান। চক্ষু বন্ধ করে তিনি আসন বাঁধেন লোকজনকে বিভ্রান্ত করে তিনি কানের কাছে ফিসফিস করেন। মস্তক মুণ্ডিত বিধবা এবং অন্যদের তিনি দক্ষিণার বিনিময়ে দীক্ষা দেন। জৈন সাধুরা দীর্ঘ নখ ধারণ করে মলিন বেশে থাকে এবং নগ্ন হয়ে কেশ উৎপাটন করে। যারা ক্ষপণক তারা জ্ঞান-বিড়ম্বিত এবং মোক্ষের উদ্দেশে তারা আত্মাকে খুঁজে পায়না। যদি নগ্ন হলেই মুক্তি হতো তাহলে কুকুর শৃগালও মুক্তি পেতো। যদি লোম উৎপাটন করলেই সিদ্ধি লাভ হতো তাহলে যুবতীর নিতম্বই সর্বপ্রথম সিদ্ধি লাভ করত। যদি ময়ূর পুচ্ছ হাতে রাখলেই মোক্ষ লাভ হয় তাহলে ময়ূর এবং চমরের তা প্রাপ্য হতো। যদি উচ্ছিষ্ট ভোজনে জ্ঞান লাভ হতো তাহলে হস্তী এবং তুরঙ্গ জ্ঞানী হতো। সরহ বলেন, ক্ষপণকদের কোন মুক্তি আমি দেখিনা। শরীরকে ব্যথা দিয়ে তত্ত্ব পাওয়া যায় না, শুধু ব্যথাই পাওয়া যায়। শ্রমণ, ভিক্ষু এবং স্থবির সবাই বন্ধ্যা যাযাবর জীবন যাপন করেন। কেউ সূত্রান্ত ব্যাখ্যায়ই ব্যস্ত এবং চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে তার চিত্ত বিশুষ্ক হয়ে যায়। কেউ মহাচক্র নিয়ে ব্যস্ত। আবার কেউ রয়েছেন মহাযান সাধক। তিনিও মণ্ডল এবং চক্র নিয়ে ভাবনায় বিভোর। কেউ রয়েছেন শূন্য গগণে আসক্ত, আবার কেউ নানাবিধ পরিজ্ঞান নিয়ে ব্যস্ত। সহজ সাধনা ছেড়ে দিয়ে তারা নির্বাণের দিকে ধাবিত হচ্ছে। যথার্থ পরমার্থ সাধনা কেউ করেনা। যে যেরকম সাধনা করছে তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকছে এবং মোক্ষ লাভের জন্য সকলেই ধ্যানে প্রবিষ্ট হচ্ছে। কেউ প্রদীপ জ্বালাচ্ছে, কেউ নৈবেদ্য দিচ্ছে এবং কেউ মন্ত্র উচারণ করছে। কেউ তীর্থে যায়, কেউ তপোবনে যায়। মোক্ষ লাভের জন্য কেউ স্নান করছে। এসমস্ত অলীক এবং বন্ধ্যা সাধনা ছেড়ে দাও। এগুলো নিয়ে আবিষ্ট থাকা হচ্ছে এক প্রকার মূঢ়তা। পরিজ্ঞান লাভতো নিজের জন্য, অন্য কারোর জন্য নয়। গীত গেয়ে কি সর্বকে পাওয়া যাবে? যে পাঠ করে সেই কি গুণী হয় এবং শাস্ত্র পূরাণ ব্যাখ্যা করতে দক্ষ হয়? যে লক্ষ্য করতে জানেনা তার আবার দৃষ্টি কি? অতএব শ্রদ্ধেয় গুরুর পদচিহ্ন লক্ষ্য কর। যদি মোক্ষকামী গুরুর হৃদয়ে প্রবেশ করে তাহলে হাতের উপর রত্নের

মত তা উপলব্ধ হবে। সরহ বলেন, পৃথিবী ভ্রান্তির মধ্যে আছে। অপদার্থ তার যথার্থ প্রকৃতি দেখতে পায় না।

করুণা রহিত যে শূন্য সাধনা সে সাধনায় নিমগ্ন থেকে কেউ উত্তমমার্গ পাবেনা। অথবা যে কেবল করুণার সাধনাই করে সেও জন্মান্তরে মোক্ষ পাবে না। কিন্তু যিনি দুটোকেই মিলাতে পারেন তিনি অস্তিত্বেও থাকেন না, নির্বানেও থাকেননা। জ্ঞানহীন যদি প্রব্রজ্যায় থাকে তাহলে সে সেই গৃহীর মতো হয় যে ভার্যা এবং পরিজন নিয়ে বাস করে। বিষয় রোমন্থন করা মিথ্যা মাত্র। সরহ বলেন পরিজ্ঞানই হচ্ছে যথার্থ সত্য। যদি সব কিছুই প্রত্যক্ষ হয় তাহলে ধ্যান করে লাভ কি? যদি তা অদৃষ্ট হয় তাহলে অন্ধকারের সাধনা করে কি হয়? সরহ সবসময় আশ্বাস দিচ্ছেন সহজ স্বভাবই হলো সবটুকু, তার অস্তিত্বও নেই অনস্তিত্বও নেই। যা উপজিত হয় তাই আবার নাশপ্রাপ্ত হয়। তাকে নিয়েই পরম মহাসুখ লাভের সুযোগ রয়েছে। সরহ বলেন, পশু স্বভাবের মানুষ আসলে কিছুই বুঝতে পারে না– অস্তিত্বও না অনস্তিত্বও না। কেউ ধন সঞ্চয় করে, আবার কেউ আনন্দে প্রদীপ জ্বেলে রাখে। কাল অতিক্রান্ত হয়, তখন দুইই চলে যায়–একথা বলে কি কোন লাভ আছে? অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীকে একজন গভীরভাবে ভোগ করেন আবার একজন মুক্তিতে প্রবেশ করেন। এদেরকে জ্ঞান দিয়ে কি লাভ? আমি দু'টো পন্থার কথাই বললাম, যে এ দুটি পন্থার ভেদাভেদ জানে সেই যথার্থকে পায়।

চিত্ত এক এবং চিত্ত হচ্ছে সকল কিছুর বীজ এবং নির্বাণ চিত্ত থেকেই বিস্ফূরিত হয়। সেই চিন্তা মনের রূপ এবং সেই চিন্তায় নিমগ্ন থাকলে সাধক ইচ্ছা ফল পাবেই। কর্মবন্ধন থেকে কর্মবিমুক্ত হলে মন মুক্ত হয়। এবং এভাবেই মোক্ষ লাভ ঘটে এবং পরম নির্বাণ ঘটে অক্ষর দ্বারাই সকল জগত আবদ্ধ। এখানে কেউ নিরক্ষর নেই। যখন কেউ নিরক্ষর হয় তখন অক্ষরে ধৌত হয়ে সে শুদ্ধ হয়। যে বন্দী সে দশদিকে ধাবিত হয় কিন্তু যে মুক্ত সে নিশ্চল থাকে। এভাবেই আমি সবকিছু দেখছি এবং এভাবেই সবকিছু প্রতিভাত করলাম। চিত্তকে মূল হিসাবে লক্ষ্য না করলে সহজ তথ্য পাওয়া যাবে না। কখনো উপজিত হয়, কখনো বিলয়ে যায়, কখনো স্থির হয়ে স্ফূরিত হয়। মূলরহিত যে চিন্তার তত্ত্ব গুরু-উপদেশে তাই ব্যক্ত হয়। সরহ বলেন, নিপুণভাবে সবকিছু জানো এবং এভাবেই পরম সহাসুখকে পাবে।

ইন্দ্রিয় যখন বিলীন হয় তখন আত্মসত্তা বিনষ্ট হয়। গুরুর পদ ধারণ করে প্রশ্ন করে জানো যে এভাবে তনু সহজানন্দে বিভোর হয়। যখন মন নিঃশেষ হয়ে পবন হয় তখন সে লয় পায়। সরহ বলছেন, এ অবস্থাতেই পরম মহাসুখ। যেখানে ইচ্ছা মন সেখানেই যায় অথবা নিশ্চল থাকে। লোচন যখন অর্ধ উদ্‌ঘাটিত তখন দৃষ্টি বিশ্রাম কামনা করে। যদি উপায় উপায়ের পিছনে ধাবিত হয় অথবা করুণা কেবল

যাঞ্চা করে হয়, যদি পুনরায় উভয়কে যুক্ত করা যায়, তখনই ভবনির্বাণ সম্ভবপর হয়। প্রথমে যদি আকাশ বিশুদ্ধ থাকে দেখতে দেখতে দৃষ্টি নিরুদ্ধ হয়। এভাবে যদি আয়াসে কাল অতিক্রান্ত হয় তাহলে বোঝা যাবে না কখন নিজ মন দূষিত হলো। অভিমান দোষে কেউ তত্ত্ব লক্ষ্য করেনা। সকলেই দোষারোপ করে প্রদত্ত জ্ঞানকে। সকল লোক ধ্যানে মোহিত হয়ে আছে এবং কেউ নিজ স্বভাব লক্ষ্য করে না। চন্দ্র সূর্য ঘর্ষণ করে অনুত্তরকে এভাবে পাবে বলে লোকেরা ধারণা করে এবং সকল জ্ঞান হচ্ছে নিগূঢ় তত্ত্বের জ্ঞান। এভাবে যে মূঢ় সে সহজ স্বভাবকে জানেনা। যখন সাধক নিজ মনকে শোধিত করবে তখনই গুরু-গুণ তার হৃদযে প্রবিষ্ট হবে। একথা মনে করে সরহ গান করছেন। মন্ত্র নয় তন্ত্র নয় সবই এক সহজ সাধনা। কেউ গুণহীন অথবা নিরক্ষর হলেও শ্রীগুরুপদ ধারণ করে তারা অক্ষরজ্ঞান লাভ করে। দেখেও আমি দেখিনা। স্বরূপ দেখেও আমি কিছু উচ্চারণ করিনা। সরহ বলেন, সবকিছুই তত্ত্বসার মাত্র। মোহগ্রস্ত মানুষ কোন কিছুকেই যথার্থরূপে পায় না।

যদি অহর্নিশ একজন সহজ সাধনায় প্রবেশ করতে পারে তাহলে তার আগমন এবং গমনের নিবৃত্তি ঘটে। ভাব এবং অভাব কোনটাই সফল কর্ম নয়। অন্তরালে স্থিত থাকে সকল সত্তা। বিবিধ প্রকারের মধ্যে মানুষ চিত্তকে অর্পণ করে, কিন্তু সত্যিকারের চিত্র কোথাও অঙ্কিত হয় না। ইন্দ্রিয় বিষয়ের কোন স্থিতি নেই। আপন চিত্তের অন্তরে কাল বিগত হয় এবং ধ্যানকেই মানুষ মহাসুখ মনে করে। পরম পদ হল যথার্থ আশ্রয় এবং সেখানেই লীন হওয়া বাঞ্ছনীয়। ধ্যান রহিত অবস্থা এবং ধ্যানের অবস্থা-এই দুইয়ের মধ্যে যা অবাচ্য তা আমি কি করে ব্যাখ্যা করি?

ভব-সমুদ্রে সকল জগৎ প্রবাহিত হয় এবং নিজ স্বভাব কেউ পরিত্যাগ করে না। মন্ত্র নয়, তন্ত্র নয়, ধ্যান নয়, ধারণও নয়—হে মূর্খ, সব কিছুই হচ্ছে বিভ্রমের কারণ। মলিন চিত্তের কাছে ধ্যান হচ্ছে খড়্গের মত অর্থাৎ সে চিত্ত ধ্যানে প্রশান্তি পায় না। মানুষ সুখ থাকতে বিসস্বাদের সৃষ্টি করে। গুরুর বচন হচ্ছে অমিয় রস তুল্য। সেই রস যে পান করতে পারে সে দ্রুত সেখানে ধাবিত হয়। বহু শাস্ত্রার্থ হচ্ছে মরু স্থল, তৃষিত সেখানে মৃত্যু বরণ করে। মন যদি নির্মল সহজ অবস্থায় থাকে সেখানে শত্রু প্রবেশ করতে পারে না। এখানে যদি কেউ চিত্ত স্থাপিত করতে পারে সেই জীন বা জ্ঞানী হয় যেমন লবণ বিলুপ্ত হয় পানিতে, তেমনি যদি সহজ সাধনায় বিলুপ্ত হয় তখন সাধক নিজেকে অন্যের মধ্যে দেখে। অর্থাৎ আত্ম-পর চিন্তা তার থাকে না।"যুবতী চিত্তকে ব্রহ্মা মর্যাদা দেন না, অন্য কে আছে যে আমাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে? নামের মধ্যেই সত্য-অসত্যের প্রকারভেদ ধরা

পড়ে সবকিছু পরমার্থে একাকার হয়। মানুষ খাদ্যে পানীয়ে এবং সুরত রমণে ব্যস্ত। এভাবে সকলেই চক্রাকারে ঘুরে ফিরে মরছে। এভাবেই তারা সিদ্ধি পাবার আশায় পরলোক গমন করে এবং মাথায় পা দিয়ে ভবলোকে অবস্থান করে।

যেখানে মন পবন সঞ্চরণ করে না সেখানে রবি-শশী প্রবেশ করে না। সেখানে হে মূঢ় চিত্ত বিশ্রাম করে—সরহ এই উপদেশ উচ্চারণ করছেন। এককে এক বলে গ্রহণ কর অথবা দুই বলে গ্রহণ কর অথবা দ্বৈতের মধ্যে বিশেষ যদি না কর তাহলে জানবে একই রঙে সব কিছু রঞ্জিত এবং ত্রিভুবন সকল অশেষ। আদি নেই, অন্ত নেই, মধ্য নেই, নেই ভব অথবা নির্বাণ এতেই তো পরম মহাসুখ। এ অবস্থায় কেউ পর নয়-কেউ অপরও নয়। অগ্রে পশ্চাতে দশ দিকে যে যেখানে দৃষ্টিপাত করুক না কেন সাধক কখনও কাউকে প্রশ্ন করেন না। বাইরে আমরা স্বার্থকে প্রকাশ করি এবং অভ্যন্তরে অনুভব করি। সকল স্বাদ এভাবেই পাওয়া যায়, কেউ স্বাদ গ্রহণ করে, কেউ করে না। আপন-পর তো কেউ নেই, গমনাগমন হচ্ছে মানুষের ভাগ্য। তুষ বাছতে বাছতে কাল অতিক্রম হল, চাউলে এখনও হাত পড়ল না।

রবি-শশী উভয়কে মান্য করে না। মনে রাখবে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর সবই ভ্রান্ত। শাসন হচ্ছে কর্দমলিপ্ত এবং এভাবেই পৃথিবীর স্বরূপ জাগ্রত হয়। দারা-পুত্র নিয়ে সুসংস্থিত ভোগের মধ্যে মানুষ থাকে এবং প্রত্যেক মানুষ আপনাপন বুদ্ধি অনুসারে পৃথিবীতে পাঠ করে এবং ব্যাখ্যা করে। অধ-উর্ধ্ব মার্গে প্রবেশ করে চন্দ্র সূর্য উভয়কেই পরিহার করে। এভাবেই কাল বঞ্চনায় কেটে যায় এবং মানুষ বিকারের মধ্যে স্থিত থাকে মানুষ কি যে প্রত্যয় করে সে জানে না। প্রিয় দর্শন নষ্ট হয় এবং নিশি সন্ধ্যা বিফলে হারিয়ে যায়। আত্মা হচ্ছে শূন্য এবং অস্তিত্ব হচ্ছে নাস্তি এবং পৃথিবীও হচ্ছে শূন্য। ঘরে ঘরে এই আখ্যানই অনুভূত হয়। তরুবরের মূল না জেনে কিইবা ব্যাখ্যা করা যায় যদি রসাতলেও পৌঁছে যায় অথবা দুর্গম আকাশে তবুও মানুষ মিথ্যাচারকে মেনে চলে। মোক্ষের কথা তারা যে বলে সেটি অভ্যেসবশত তারা বলে। বুদ্ধি বিনষ্ট হয়, মন মরে যায় এবং অভিমান টুটে যায়। পরম পদ হচ্ছে মায়াময়, তাকে নিয়েই ধ্যান কর। পৃথিবী যদি মানুষের উদ্দিষ্ট হয় তাহলে সে ক্ষয়ে নিমজ্জিত হয়। ভাব রহিত অবস্থায় কি করে জাগাতে হয় তা মানুষ জানে না। দ্বৈত বিবর্জিত ভাব যদি জাগ্রত হয় তাহলে সেটাই মঙ্গল- একথা শ্রীগুরুনাথ বলে থাকেন।

আমরা দেখছি শুনছি ভ্রমণ করছি স্থিত থাকছি, বসে থাকছি এবং উঠছি নানা রকম ব্যবহারে এবং কর্মে কত বাক্য উচ্চারণ করছি কিন্তু মন ছেড়ে দিয়ে একাকার হয়ে চলতে পারছি না। চিত্ত আছে অচিত্ত আছে, সে রকমই থাকছে যেরকম

থাকতে চাচ্ছে। যদি গুরুর বচনকে ভক্তিভরে গ্রহণ করতে পারি তবেই সহজ উল্লাস ঘটবে। অক্ষরার্থ পরমগুণ সম্পন্ন আমি বলছি এর মধ্যে কোন ভ্রান্তি নেই পরমেশ্বর এ-কথাই বলেন কুমারীর মধ্যে রতিভাব যেভাবে উপজিত হয়। ভাবে এবং অভাবে আমরা সর্বদাই লিপ্ত এভাবেই জগত আপন স্বভাবে বিলীন হয়। যখন তোমার মন নিশ্চল থাকে তখনই ভব নির্বাণ ঘটে। যে লোক আপন এবং পরের ভেদ জানেনা সেই অনুত্তরকে পায়। আমি এখন যে কথা বলছি সে-কথাকে ভ্রান্তি ভেবো না, আপনা-আপনি বুঝবার চেষ্টা কর। অণুপরমাণু তার রূপ বিনষ্ট করেনা। মানুষ যা ভাবে তাই নতুন রূপে স্ফূরিত হয়। সরহ বলেন পৃথিবীতে বারবার মানুষ ধাক্কা খায় সুতরাং পার্থিব অবস্থা থেকে বেরিয়ে এলেই আমরা সব কিছু স্পষ্ট বুঝব। অগ্রেই থাকো অথবা বাইরেই থাকো, পতি দেখুক অথবা পড়শী জিজ্ঞেস করুক কোনটাতেই কিছু হয় না। সরহ বলেন হে মূঢ় নিজেকেই জানবার চেষ্টা কর। ধ্যেয় কেউ নেই ধারণ করবারও কিছু নেই। যদি গুরু বলেন তবেই সব কিছু জানব এবং তখন মোক্ষ মিলবে এবং আপন কণ্ঠস্বরকেও খুঁজে পাব। দেশ-ভ্রমণ অভ্যাসেই পরিণত হয়। মানুষ সহজকে না বুঝে পাপে নিমগ্ন হয়, বিষয়কে গ্রহণ করে বিষয়ে লিপ্ত হবে না তরঙ্গের স্রোতধারায় নিমজ্জিত হবে কিন্তু পানি স্পর্শ করবে না। এভাবেই যোগী মূলে প্রবেশ করেন; বিষয়ের বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে বিষয়ের মধ্যে রমণ করেন। দেব পূজা করে কি লক্ষ্য লাভ হবে, আপনাকে হত্যা করে কি করে তুমি সিদ্ধি লাভ করবে? তথাপি মানুষ এই সংসারে ভ্রমণ করে চলেছে। কোন রকম আভাসেই তার নিঃসরণ ঘটছে না। ভাব-অভাব হচ্ছে ভাবেরই অনুরক্ত, এটাকেই পশুস্বভাবের সত্য হিসেবে গণ্য করবে। যারা ধ্যানে মোক্ষলাভের চেষ্টা করেন তারা ভবরাক্ষসের দাস। হংসকে ধৃত করে আমি মৌলিক ভেদের কথা বলছি, অধো-ঊর্ধ্ব দুই পক্ষই ছেদ করে যাও। পক্ষ না থাকলে কোথায় সে যাবে? দেহ মূঢ়তার মধ্যে নিশ্চল থাকে। পণ্ডিত সকলে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন তাঁরা দেহকে বুদ্ধির আধার মনে করেন কিন্তু বসন্তকে জানেন না। অবনাগমন বা আসা যাওয়া হচ্ছে একই রূপ খণ্ডিত। নির্লজ্জ পণ্ডিতরা এবম্বপ্রকার ভ্রমেই পতিত হয়ে থাকেন।

যতই চিত্ত বিস্ফূরিত হয় ততই নাথস্বরূপ জাগে। অন্যতরঙ্গ অথবা অন্যজল যাই হোক না কেন, ভব-সমকে খ-সম স্বরূপে রূপান্তরিত করতে হবে। এহেন বচন না গুরুতে বলেন না শিষ্য তা বোবে। সহজস্বভাব হচ্ছে অমিয় রস, তাকে আমি কি করে বর্ণনা করবো। যতোই মানুষ জলের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করবে ততোই তা সমরস হবে। চিত্ত হচ্ছে দোষগুণের আকর যে-মূঢ় যে প্রতিপক্ষ বোঝে না সে সহজে সহজ বুদ্ধিকে পরিত্যাগ করে, সে বিবিধ প্রকার বঞ্চনা সহ্য করে। বাসনাকে একান্ত করে দেখো না, সকল জিন-শাসন হচ্ছে এটাই। সকল

জগত যার কাছে মুক্ত তার কাছে কোন বন্ধন নেই। যে মূঢ় সে মোহে প্রমত্ত থাকে এবং শাস্ত্রাবস্থাকে সেবা করে। চিত্তের প্রসরণ নিরন্তর দেখা যায় আবার লোভ মোহ তারও বিস্তার দেখে। দক্ষ রূপে যদি চিত্তকে বিভাসিত রাখা যায় তবে সেখানে মায়াজাল প্রতিভাত হবে। সকলকে এভাবেই চিহ্নিত করা যায়। যেখানেই চিত্তের জাগরণ সেখানেই তার বিলীনতা! সহজকে যখন সহজে বোঝা যায় অন্তরালের গতি তখন ভেঙে যায়। সমৃদ্ধি এবং সফলতা দুটি বিশিষ্ট কোন কর্ম নয়। সেখানে পাপ পুণ্য অবস্থান করে। যে ব্যক্তি অনুত্তরকে অনুভব করে, সরহ বলেন তখনই সে সিদ্ধি লাভ করে। গুরুর বচন যখন সংসিদ্ধ হয় তখনই সকল ইন্দ্রজাল নেমে যায়। সরহ বলেন, অনুত্তরই হচ্ছে ধর্ম। হরি, হর এবং বুদ্ধ সবাই এক। জানবে যে শুদ্ধি তখনই আসে যখন একজন সাধক জিনগুণ রত্ন লাভ করে। মোহমুক্ত যে হতে পারে বুদ্ধির সাহায্যে সে মোক্ষ লাভ করে এবং সম্মানিত হয়। হাতের কঙ্কণ কখনোই স্থির থাকেনা। তা হচ্ছে গুণদোষ বীক্ষণের দর্পণের মতো। বুদ্ধই সাধকের মনে মুক্তা আনে। এবং এই মুক্তার বাহ্যমান যাই হোকনা পরমার্থকে জানতে হবে অর্থ চিহ্নবিহীন সর্ববিচ্ছিন্ন রূপে। যদি কেউ ব্যবচ্ছিন্ন এবং অব্যবচ্ছিন্নের মধ্যে অন্তর নির্ণয় করতে পারে সে স্বয়ং সংবৃত্তি লাভ করে এবং ধাঁধার মধ্যে থাকেনা। ভাব অভাবের মধ্যে সে আবদ্ধ থাকে না। যে যোগী নিজের মন এবং মননকে পূর্ণ করতে পারে সেই জলের মধ্যে জলকে মিশিয়ে দিতে পারে। ধ্যানের মাধ্যমে মোক্ষ লাভের প্রবৃত্তি দেখি এবং তখন মনে হয় সাধক মায়াজাল ক্রোড়ে ধারণ করে আছে। গুরুবচনকে সত্য বলে যে প্রত্যয় করে সরহ বলেন সেই মুক্তি লাভ করে। নিজ স্বভাবে মানুষ কখনো বচন লাভ করে না। গো-প্রজাতির দিকে লক্ষ্য কর, তারা আদেশেই চলে। যে এক স্থানে স্থির হয়ে বসে থাকাকে দোষ ধরে না তার কাছে ধর্মাধর্মের বিচার নেই। চিত্ত যদি বন্ধনের মধ্যে থাকে তবে সে চিত্তের অবস্থান তো সন্দেহের। যিনি জড়ের মতো বন্ধন দশায় রয়েছেন তার মুক্তি তেমন অবস্থাতেই। যে বন্ধন দশায় আছে সে দশদিশে ভ্রমণ করছে। আবার যে মুক্ত সে নিশ্চল হয়ে রয়েছে। করভ যেমন তার সঙ্গিনীকে দেখে, মোহ তেমনিভাবে প্রতিভাত হয়। পবনধারণ করে নিজের অস্তিত্বকে পাওয়া যাবে না। কঠিন যোগ সাধনা করে নাসারন্ধ্রে মুক্তি আসবেনা। ওরে মূঢ়, সহজ গতির পথে চলতে থাক তখন দেখবে ভবগন্ধ তোমার প্রতিপদে উপস্থিত হবেনা। নিজ মন হচ্ছে তুরঙ্গের মতন চঞ্চল। এ স্বভাব দূর করে স্থায়ী হয়ে দোষমুক্ত হবার চেষ্টা কর। যখন মন অন্তমন হয় তখনই বন্ধন টুটে যায়। তখন সকলেই একাকার হয়, কেউ শুদ্রও থাকে না কেউ ব্রাহ্মণও থাকে না।

এ-দেহই সব কিছু। এটিই সরস্বতী প্রয়াগ, এটিই গঙ্গাসাগর, এটিই বারাণসী-প্রয়াগ, এটিই চন্দ্র দিবাকর। ক্ষেত্র পীঠ উপপীঠ এটাই। এর মধ্যেই আমি সফল

ভ্রমণ করছি। দেহ-সদৃশ তীর্থ এমন কিছু কেউ কোথাও শোনেও নি দেখেওনি কতরকম পুষ্প আছে, স্থলকমল আছে, গন্ধকেশর আছে। দ্বৈতকে পরিত্যাগ যদি না করি তাহলে কোন প্রান্তদেশে পৌছুতে পারবো না। যে কাম-দীপ্ত সে-ও শান্ত হয়, সে-ও ক্ষয় পায়। যার কোন কুল নেই সেই কুলহীনকে পূজা করলেই ব্রহ্ম-বিষ্ণু-বিলোচন বিলীন হয়ে যায়। যদি বিষয়কে অস্বীকার করতে না পারি তাহলে বুদ্ধত্ব আসবে না। নব অঙ্কুর হেতুরহিত হবে তরু সম্পত্তি অপ্রাপ্ত থাকবে। যেখানে সেখানে যেমন তেমন, যেমন তেমন হচ্ছেন বুদ্ধ। আপন সঙ্কল্প যদি বিনষ্ট করা যায় তাহলেই জগত স্বভাবতই শুদ্ধ হবে। সহজকে গ্রহণ কর, সহজই হচ্ছে শুদ্ধ। শরীর এবং পা পানিতে ভিজাও কিন্তু পানি যেন না লাগে যেমন রাজহংস।

পৃথিবীতে বহু দুঃখ উৎপন্ন হয় আবার সেখানে সুখের সারাৎসারও উৎপন্ন হয়। কোনটা যে উৎপন্ন হয় এবং তা কিভাবে, লোকে তার সারবত্তা জানেনা। হে পুত্র, তত্ত্ব হচ্ছে বিচিত্র রস তা বলাও যায় না ব্যক্তও করা যায় না। সুখবস্তু হচ্ছে কল্পরহিত, তুমি নিজস্বভাবে এক-কে সেবা কর। কখনও গুণকে ধরবার চেষ্টা কর অথবা এক-কে ধরতে পারছো বা এমন যদি হয় তাহলে শূন্য-অশূন্যকে বুঝবার চেষ্টা কর। মনে রাখবে গুরু নববর্ণে সত্যকে সমর্পণ করবেন। বুদ্ধের বচন হচ্ছে যথার্থ ধর্ম কিন্তু লোকাচার হচ্ছে পৃথিবীর কর্ম। সকল তত্ত্ব আপন স্বভাব দিয়ে দেখবার চেষ্টা কর দেখবে সেখানে লোকাচারই হচ্ছে সকল উদ্দেশ্যের মূল এবং সে-ই বুদ্ধরূপ ধারণ করে সহজ-স্বভাবে যে সিদ্ধ হয়। স্বপ্নে যেমন মানুষ কামিনীকে আলিঙ্গন করে এবং রতিসুখকে প্রত্যক্ষ ভাবে এটাই হচ্ছে মানুষ্য স্বভাব। এবং বুদ্ধরূপ ধারণ করতে পারলেই মানুষ সিদ্ধযোগ লাভ করে। যদি মন সহজ নিরন্তরকে পায় তাহলে ইন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতি সে ধাবিত হয় না এভাবেই মানুষ ঋদ্ধি লাভ করে। সরহ বলেন জিন-বিম্বকে দর্শন করবার এটাইতো পথ। দোহা সঙ্গম আমি পাঠ করছি, যে তথ্যকে জানে সেই তা বুঝতে পারবে। এই সংসারকে যে গ্রহণ করে সে সংসারের মধ্যেই তথ্যকে পায়। সংসার যার গুণ বা ধর্ম অথবা শাস্ত্রার্থ যে অবলম্বন করে সেও তার মধ্যেই আপন সিদ্ধি খোঁজে। সেখানেই দোহাকোষের ভাষা আবদ্ধ হয় এবং সেখানেই চিত্তস্বন্ধ সমাপ্ত হয়। যদি যা বলা যায় না তাই বলবার চেষ্টা কর অথবা যাকে বলছি সে যদি প্রত্যয় না করে, যদি প্রমাদে বশীভূত থাকে তখন মূঢ়তায় আচ্ছন্ন হবে। যদি চণ্ডালের ঘরে প্রবেশ করি সেখানে আচ্ছাদনের প্রয়োজন হবে না। সহজকে সহজে মানবার চেষ্টা কর। ভবপাশে যে বদ্ধ থাকে সে বদ্ধই থাকে। হে মূঢ়, আশার কথা কি বলব তোমাকে, সদগুরু কিরণ হচ্ছে বজ্রের মত। সসংবেদন এমনই একটি তত্ত্ব যা মূঢ় বুঝে উঠতে পারে না এবং সাধারণ লোক তা মানে না। যা সহজেই মনগোচর হয় তা পরমার্থ হয়না। নিজ স্বভাবকে গগনসম কর এবং আপনপর ভেদ করো না। সহজানন্দ

হচ্ছে চতুর্থভাবে যা ব্যাখ্যা করে বলা যায় না। বিনাবাদনে যেমন শান্তিজল তেমনি হচ্ছে মায়ায় আচ্ছন্ন মন। সকল বিষয় স্বভাবে সিদ্ধ হয় না। প্রকৃষ্ট উপায় কি তা বুঝিয়ে বলা যায়না। জীন-বরের বচন সত্য বলে প্রত্যয় হয়। সরহ বলেন আমি এই বচনকেই প্রমাণ্য বলছি। সহজে সহজ বোধীকে যে জানে অচিন্ত্য যোগে সে সিদ্ধকাম হয়। যেমন জলমধ্যে চন্দ্র সে সত্যও নয় মিথ্যাও নয়। তেমনি মণ্ডলচক্রের মধ্যে সাধক নিম্নমার্গেও নেই উচ্চমার্গেও নেই।

চিত্তদের, যে সকলের মধ্যেই বিরাজিত, তবে চিন্তনকে পরিশ্রম করে পেতে হয়। চিত্তদেব সকলের মধ্যেই আছে কিন্তু সহজ স্বভাবে তাকে যথার্থরূপে অনুভব করতে হয়। যদি লক্ষ্য করা না যায় তবে চিত্ত চিত্তই থাকে। এবং চঞ্চল মনপবন স্থির থাকে। চিত্ত যখন স্থির থাকে তখন চিত্ত নির্মলভাবে আপ্লুত থাকে, সেখানে ভ্রারও প্রবেশ করেনা অভাবও প্রবেশ করেনা। এভাবেই একদেব বহু আগম হয়ে দেখা দেন এবং আপন ইচ্ছামত মানুষ আপন চিন্তাকে স্ফূরিত দেখে। যিনি হচ্ছেন আপন নাথ তিনিই হচ্ছেন অপরের বিরুদ্ধতা। এভাবেই ঘরে ঘরে সিদ্ধান্তের প্রসিদ্ধি। হৃদয়ে কাজকে মণি ভেবে যে তুষ্ট থাকে বোধিমণ্ডলের মহাসুখে সে প্রবেশ করতে পারেনা। চিত্তরাগ সংবরণ করে, নিজেকে সুদৃঢ় ও সুস্থ করে যদি তা করতে পার বিষয় ভুজঙ্গ তোমাকে দংশন করবেনা। পিঞ্জরে যেমন পক্ষী নিশ্চল থাকে তেমনি মনকে অচঞ্চল রাখতে হবে। অচিন্ত্য বিড়ালকে যদি কেউ ধারণ করতে পারে তখন তা বাকশক্তিরহিত এবং চলৎশক্তিরহিত স্থির থাকে। চিন্তা-অচিন্ত্যের ভেদ বোঝা যায়না কিভাবে পরিজ্ঞান আসবে বলতে পরিনা। যে গুণবান সেই বুঝতে পারে। উভয়কেই শিরোধার্য করে নাও। যদি দুষ্টু মন স্থানে গমন না করে এবং ইন্দ্রিয়ের মধ্যে বিচরণ করে তাহলে পশুগৃহে চোর মন্ত্রণা পাঠ করেই প্রবেশ করবে এবং এভাবেই তার ত্রৈলোক্য লাভ। যদি ছায়ায় ছায়ায় অবসিত হয়ে বসে থাকে তাহলে দেহ বসন্তে চিত্ত দর্শনীয় হবে না। যে নিজের মনকে জানে সকল জগত তার কাছে স্বপ্নের মত মনে হয়। নির্বাণে যে স্থিত এবং ধ্যানে বিরাজিত সে অন্যমন্দ এবং অন্য আয়ুসহ বিচরণ করে। ধ্যানে নয় প্রব্রজ্যায়ও নয় দেহবসন্তের মধ্যেই সমরস রয়েছে। ঘরে ঘরে এ-কাহিনী বর্ণনা করবে মহাসুখকে কি করে পরিজ্ঞান করা যায়। সরহ বলেন জগতে চিত্তবহমান, সেই অচিন্ত্যে কেউ প্রবেশ করতে পারে না।

যে মানুষ করুণাকে মানতে চায় তার কাছে ভবপাশ খুব সুদৃঢ় লাগে। অতিরূপ অন্য যদি অনক্ষর না হয় তাহলে শূন্যকামী চিত্ত বিনাশ হবে। যেমন জলে শশির ছায়া দেখা যায় তেমনি সকলের মায়ার মধ্যে এই ভবজীবন প্রতিভাস হয়। এ ধরনের চিত্ত ভ্রমণ করছে এ-অবস্থায় দৃষ্ট হয় না সে চিত্তভব নির্বাণে নিরন্তর প্রবিষ্ট হয়।-যোগ্যতার কোন অন্ত নেই এবং কালও বিনষ্ট হয়। মনে রাখবে, মূলত সকল কর্মই এক। যারা শ্বাস রুদ্ধ করে নিস্পন্দ লোচনে থাকে তারা মনে করে তাদের

চিত্ত সকল বিচার বিমুক্ত। এ-অবস্থায় যে গত হয় সে যে যোগী তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিষ্ঠুর সুরতি সম্পাদনায় সে কমল কুলিশকে সম্পত্তি করে ক্ষণে ক্ষণে বোধীকে আয়ত্ত করবার জন্য যোগী নির্বাণ সংবৃত্তি লাভ করতে চায়। এগুলো বড়ই কঠিন পদ্ধতি—আমি এখানে পূর্ণ লক্ষণ বর্ণনা করলাম। যখন দ্বৈত রহিত হয়ে একজন নিপুণতা অর্জন করতে পারে তখন সে অনুত্তর বোধী বিজ্ঞানকে লাভ করে। কমল বনে যেন প্রবিষ্ট হয়ে সে রসভুঞ্জন করছে। এভাবেই সন্তপ্ত সকলেই চিত্তগজেন্দ্রকে রজ্জুতে বন্ধন করে। আলয়তরু উৎপটিত করে জগতে নিজের জন্য সাচ্ছন্দ্য নির্মাণ করে। মত্ত গজেন্দ্র গম্য অগম্যের মধ্যে ভেদ জানেনা। কিন্তু যদি পৃথিবী সহজ আনন্দে পূরিত হয় তাহলে সাধক নেচে গেয়ে বিলসিতভাবে সময় কাটাতে পারে। যদি আবার কেউ বাসনার মধ্যে প্রবেশ করে তাহলে সে পুনরায় পৃথিবী রূপ ফাঁদে পতিত হবে। মূলত সমতা কামিনীকে অনুভব করতে হবে এবং সমরস ভোজন করে অম্বরে বাস করতে হবে। তখন বিভিন্ন অবস্থানের মধ্যে কোন অন্তর থাকবেনা। এবং চিত্তরাগ নিরন্তর সমতা বোধিতে বিলসিত হবে।

শূন্য নিরঞ্জন হচ্ছে পরম প্রভু এবং তার স্বভাব হচ্ছে স্বপ্নের উপমার মত। ভাব হচ্ছে চিত্তের স্বভাবতা, তাকে নাশ করা যায় না। রবি-শশি যখন বন্ধন করা যায় তখন অ-রতি তলে মোক্ষ লাভের বাসনা জাগে। আমি রবি দেখছি এবং বুদ্ধ বিজ্ঞান পাঠ করছি এবং আমি অনুভব করছি যে এর মধ্যে মোক্ষ নেই। পৃথিবীও নয় নির্বাণও নয় আমাকে মহাসুখ দ্রষ্টব্য করতে হবে। যে-ভাবনায় মন সদা ভাবিত তার উপরই মানুষের সমস্ত কর্ম সাধন নির্ভর করে। কিন্তু যথার্থ মুক্তি হচ্ছে অক্ষর বর্ণ বিবর্জিত যা বিন্দুও নয় চিত্তও নয়। এই হচ্ছে পরম মহাসুখ এর মধ্যে এ প্রসারিতও নয় ক্ষিপ্তও নয়। এটা হচ্ছে প্রতিবিম্বের স্বভাব। ভাবকে এভাবে আবিষ্কার করতে হবে। শূন্য নিরঞ্জন হচ্ছে পরমপ্রভু সেখানে পুণ্যও নেই সেখানে পাপও নেই। পঞ্চ কামগুণে মানুষ নিশ্চিন্তে থাকে এবং স্থিত থাকে। পরমপদ লাভ করতে হলে চিন্তা তত্ত্বকে পরিহার করতে হবে এবং সহজবোধিকে আয়ত্ত করতে হবে। যে মন দুর্জয় পাণ্ডিত্যে ভরপুর সে আসল তত্ত্ব কখনোই বোঝে না। ধ্যেয়ও নয় ধারণও নয় মন্ত্রও নয়—এসবের মধ্যে শিবশক্তি নেই। লক্ষ্যালক্ষ্য বিনা জীবন যদি পাওয়া যায় তবে সেখানে ভাব প্রসক্তি থাকে না। সেখানে নিদ্রা থাকে না সেখানে স্বপ্ন থাকেনা সেখানে জাগর অবস্থা থাকে না সেখানে সুষুপ্তি অবস্থা থাকে না। ভাব-অভাব হচ্ছে একপ্রকার নিবন্ধনের মত সেখানে চিত্তকে পাওয়া যায় না। সে এমন এক অবস্থা যেখানে স্থিতি নেই গমনও নেই, সেখানে অবিচ্ছিন্নতা নেই। কাউকে কোন কর্মে যে প্রবৃত্ত করায় না অথবা নিজেও প্রবৃত্ত হয় না সে সর্বদাই হেতু বিচার করতে থাকে। পরমপদ সাধনার আদি নেই অন্ত নেই—তার মধ্যও নেই সে কথাই তো আমি বলছি। আমি তো যোগীর কথা বলছিনা যার একমাত্র কাজ পূজা করা। সেই সাধনাই চরম সাধনা যে সাধনা হচ্ছে বর্ণ আচার এবং

প্রমাণ-রহিত সেখানেই অনন্ত অক্ষরবেদ। হে পূজারী, তুমি কি পূজা করছ? যার আদি নেই এবং অন্ত নেই তাকে কি পূজা করে পাওয়া যায়। সখি সংসার নিয়ে যে-জীবনযাপন করছে সে-কোন তত্ত্বের কথা বলবে? যে নিপুণতা জানে সে নিপুণভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে কিন্তু পরমার্থকে বিচার করতে জানে না। যেমন সারহীন কদলিতরুকে শোভমান করবার ইচ্ছা, যেমন এই সংসারে বাস করে ভূততত্ত্বকে বিচার করবার চেষ্টা, যেমন বন্ধনের মধ্যে থেকে মোক্ষ স্বভাবকে লাভ করবার চেষ্টা। বুদ্ধ সংযোগ হচ্ছে পরমপদ এবং সেটাই হচ্ছে মোক্ষ স্বভাব। সেখানেই হৃদয় উপজিত হয় এবং সেখানেই যেন সত্য জাগে। ত্রিদশজন সগুণকে আয়ত্ত করতে চায় এবং তা চিত্তে এবং মননের মধ্যে আনে। অনুপুঙ্খভাবে যদি কেউ মূল সত্যকে জানতে চায় তাহলে সে কি করে জানবে। আসলে সন্ধান করতে হবে শূন্যমধ্যে শূন্যপদকে এবং তাহলেই সবকিছু খ-সম হবে এবং তখনই খ-সম স্বভাবে চিত্ত স্থিত হবে। চিত্তকে অচিত্ত করে যদি কেউ অনুত্তরে যাবার চেষ্টা করে তার নয়ন দুটি অনুপমে নিবদ্ধ হয় এবং সে নিজগতি নিজমনকে আয়ত্ত করে। সরহ বলেন এভাবেই চিত্ত অচিত্তকে পাওয়া যায় এবং দুঃখ-মৃত্যু নিবারণ করা সম্ভবপর হয়। যে ঘরে স্থিত রয়েছে মহিমা এবং মনুষ্য সেখানে সখিকে কি করে দেখব? যে সমীপবর্তীতেই ভ্রমণ করে সরহ বলেন সেখানে সে ঘরনীকে পায় না। শঙ্কাই সকল পৃথিবীকে হনন করেছে কিন্তু শঙ্কাকে কেউ হনন করতে পারে না। যে ব্যক্তি শঙ্কায় শঙ্কিত হয় সে পরমার্থ লাভ করতে পারে না। বিরোধ এবং সংঘর্ষের জন্ম কর্মে এবং এর মধ্যেই ভাবের উৎপত্তি। হে ধার্মিক সাধক তুমি সমস্ত অলীক তত্ত্বকে পরিহার কর। মরণ রয়েছে মরণের অবস্থা রয়েছে পবনের প্রসার রয়েছে ত্রিভুবনে এভাবেই সব কিছু ছড়িয়ে আছে। সরহ বলছেন মানসলোকে যা প্রতিভাসিত হয় তার মধ্যে কোন তত্ত্ব প্রবেশ করে না। তেল সিঞ্চন করে অক্ষরকে রচনা করা যাবে না এভাবে ভব নির্বাণ লাভ করা সম্ভব নয় নির্বাণ হচ্ছে সংসারে অনুপলব্ধ বোধে নয় ধ্যানে নয় ধারণেও নয়। অদর্শন এবং দর্শনের যত রূপই থাকুক না কেন ততো রূপেই ভবনির্বাণের বোধ জাগে। যে তত্ত্বের মধ্যে কালাতিপাত করে সে-কিন্তু উদ্দেশ্যকে পায় না। চঞ্চলচিত্তকে স্থির করে পবন নিবারণ করতে হবে। যে মূঢ় সে যথার্থ মূলের জ্ঞান পায় না। তার কাছে কাল অকালের ভেদ নেই। নাদ এবং বিন্দুর যে অন্তর এ অন্তরকে যে জানে সেই তার ভেদ জানে। এভাবেই পরমেশ্বর পরমগুরু ত্রৈলোক্য উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করবেন।

টীকা

সহজানন্দ: সরহপা 'সহজ' অর্থাৎ নৈসর্গিক জীবনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সহজবাদের তিনিই প্রথম আচার্য ছিলেন। সেজন্য তাঁর প্রবর্তিত পথকে 'সহজযান' বলা হয়ে থাকে। আমরা ভারতীয় সাধনার ধারাক্রম পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, সরহপার পরবর্তীকালে মহাকবি কবীরও তাঁর একটি দোহায় সহজ পন্থার কথা বলেছেন। এই সহজ পথটা কি এবং কিভাবে এই সহজপথের সিদ্ধান্ত এবং মীমাংসা খুঁজে পাওয়া যায় তার প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা সরহপা তাঁর দোঁহা কোষে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, পৃথিবীতে কর্ম আছে পৃথিবীতে সময় আছে। পৃথিবীর কর্ম এবং সময়ের মধ্যে মানুষ অবস্থান করে কিন্তু যিনি সহজ পথের পথিক তিনি কর্ম এবং সময়ের শাসনে পীড়িত হন বা। তিনি কর্ম এবং সময় থেকে মুক্ত থাকেন। এ অবস্থাকে সরহপা এমন একটি স্নানের সঙ্গে তুলনা করেছেন যেখানে স্নানও হবে অথচ শরীর সিক্ত হবে না। এ পৃথিবী যেমন পাপের তেমনি পুণ্যের, যেমন আশঙ্কার তেমনি শান্তির, যেমন বিভ্রমের তেমনি সুস্পষ্টতার। সুতরাং মানুষকে তার জন্মগত কারণেই সকল অবস্থার মধ্যেই বাস করতে হয়। কিন্তু যিনি সহজপন্থী তিনি কোন অবস্থাতেই বিচলিত বোধ করেন না। এ অবস্থাটি হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যাকে সরহপা শূন্য স্বভাব বলেছেন। সরহপা জীবনে ভোগকে ত্যাজ্য ভাবেননি। কিন্তু ভোগের প্রতি আসক্তিকে ত্যাজ্য ভেবেছেন। সরহপা বলেছেন একটি বালক যেমন পৃথিবীতে বাস করে তেমনি ভাবেই পৃথিবীতে বাস করতে হবে। অর্থাৎ আচারমুক্ত সংস্কারমুক্ত এবং আশ্লেষমুক্ত ভাবে বাস করতে হয়। সরহপা জীবনবিরোধী ছিলেন না। সরহপা যে সহজ সাধনার কথা বলেছেন, তিনি নিজে ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রমাণও দিয়েছেন। তিনি ব্রাহ্মণ-পুত্র ছিলেন, ব্রাহ্মণত্ব পরিত্যাগ করে ভিক্ষু হয়েছিলেন এবং ভিক্ষু জীবনে সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছিলেন। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যও হয়েছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে ক্রমশ, সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর ব্যবধান বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন তিনি সবকিছু পরিত্যাগ করে সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে এলেন। ভিক্ষুদের চীবর এবং চীবর ধারণ করার নিয়মাবলী তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি একজন শবরী কন্যাকে নিজের সঙ্গিনী করলেন। তিনি বলেছেন "জগৎ সহজ আনন্দে ভরপুর রয়েছে- নৃত্য কর, গীত গাও এবং পরিপূর্ণভাবে বিলাস কর।" এর অর্থ জীবন উপভোগ করে আসক্তির চরমে উপনীত হওয়া নয়। এর অর্থ হচ্ছে আসক্তির মধ্যে থেকেই সহজকে উপার্জন করতে হবে।

সরহ যে দর্শনের জন্ম দিয়েছিলেন তাকে সহজযান বলা হয় আমরা তা পূর্বেই বলেছি। সরহের এই দর্শনের সঙ্গে 'অসঙ্গের' যোগাচার এবং নাগার্জুনের 'মাধ্যমিক

বাদ'এর কিছুটা মিল আছে। অবরহ দোহাকোষের শূন্যতা ব্যাখ্যা করতে বলেছেন। শূন্যতা এমন একটি অবস্থা যে অবস্থা ভৌতিক এবং অভৌতিক পদার্থে নিত্য অবস্থা থেকে রহিত থাকা। করুণা তথা শূন্যতার ভাবনায় যুগোনদ্ধ রূপলাভ করা হচ্ছে পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তি। যোগাচারকে ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদও বলা হয়ে থাকে। এই যোগাচার দর্শনের মূল তত্ত্ব হচ্ছে আলয় বিজ্ঞান। এ সম্পর্কে আমি ভূমিকায় সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। সরহপা সাধনাকে কোন রহস্যময় রূপ দিতে কখনও চাননি। তিনি নির্বাণ তত্ত্বে পুরাতন কল্পনা এবং ধারণাকে অস্বীকার করেছিলেন। কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তমন নির্বাণ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নির্বাণ প্রাপ্ত মন এমন একটি স্থিতিতে আসে যেখানে ভব সংসারের বন্ধন এবং কর্মপাশ থাকে না। কিন্তু বজ্রযান এবং মহাযানের সাধকরা এই নির্বাণকে অসম্ভব রহস্যময় এবং জটিল বানিয়ে ফেলেছিলেন। সরহপা এই শূন্যতাকে রহস্যমুক্ত এবং জটিলতামুক্ত করতে চেয়েছিলেন। সরহপা তাঁর যোগ এবং আচারকে অত্যন্ত সংক্ষেপ করে করুণা এবং শূন্যতার ওপর জোর দিয়েছেন। এই দুটোকে ভিন্ন ভিন্নভাবে অভ্যাসে আনা যায় না। দুটো একে অন্যের সঙ্গে যখন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় তখনই এরা কার্যকর হয়। পারিভাষিক শব্দে এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধকে 'যুগনদ্ধ' বলা হয়েছে। সরহপা অদ্বয় তত্ত্ব শূন্যতার কথা বলেছেন, আবার সব কিছুর ওপর অপার শূন্যতার কথাও বলেছেন। তিনি পৃথিবীর জীবনে দান এবং পরোপকারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, যদি প্রার্থী নিরাশ হয়ে চলে যায় তাহলে গৃহবাসী নিজের মর্যাদা হারায়। আত্ম এবং পরের মধ্যে ভেদ দূর করা হচ্ছে সাধকের পরম কর্তব্য।

জগতে উৎপন্ন হবার ফলে মানুষ সংসারে অপার দুঃখের মধ্যে পড়ে। আবার অপার সুখ সে লাভ করে। এই পৃথিবীকে সহজানন্দে পরিপূর্ণ করতে হবে। এবং তখনই একজন মানুষ আনন্দ রসে বিলসিত হতে পারে। চিত্তরূপী গজেন্দ্রকে মুক্ত করতে হবে গগণ রূপী গিরি-নদীর জলকে পান করে তটপ্রান্তে তাকে স্বচ্ছন্দ হতে দাও। একথাটি রূপকচ্ছলে বলা হয়েছে। সাধারণভাবে এর অর্থ হচ্ছে শূন্যতার চর্চা করলে জীবনকে স্বচ্ছন্দ করা যায়। 'ঋজুমার্গ' হচ্ছে সহজমার্গ এবং এখানে জীবনকে আপন নৈসর্গিকরূপে প্রকাশিত দেখা যাবে। সাধক এবং সন্তগণ চন্দ্র-সূর্য সাধনা অথবা ঈড়া-পিঙ্গলার সাধনার কথা বলেছেন। সরহপা এই সাধনার প্রশংসা করেননি। তিনি বরঞ্চ চন্দ্র-সূর্য সাধনাকে ভাবনার রন্ধ্র রুদ্ধ করার প্রক্রিয়া বলেছেন। তিনি বলেছেন এই সাধনা পরিত্যাগ করে অনুত্তর সর্বোত্তম মার্গে উপনীত হতে হবে। সরহের এই আদর্শের অনুসারী সাধক কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিব্বত অঞ্চলে পাওয়া যেত। সরহপার সাধনার বিষয়টি অত্যন্ত সহজ মনে হলেও

মূলত কিন্তু খুব সহজ নয়। তিনি বলছেন তত্ত্বকে সত্তাযুক্তও বলা যায় আবার সত্তারহিতও বলা যায় না। এর মধ্যবর্তী একটা স্থিতি আছে। তাকেও পরিত্যাগ করবার কথা সরহপা বলেছেন। অর্থাৎ সহজ সাধনা সত্তার সাধনা নয়, সত্তারহিতও নয়, আবার এই দুই-এর মধ্যবর্তী সাধনাও নয়।

সরহপার দৃষ্টিতে মুক্তি হচ্ছে একটি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। জীবের সর্বপ্রকার কল্পনাই মিথ্যাচার। শঙ্করাচার্য পরমার্থকে ব্রহ্ম বলে অভিহিত করেছেন এবং তাকেই সত্য বলেছেন। কিন্তু সরহপা ব্রহ্মাকে সত্য বলে মান্য করেননি এবং তিনি জগৎ সংসারে ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে মিথ্যা এবং ত্যাজ্য বলেননি। জগতের স্থিতি ক্ষণিক তা তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু এই তিনি প্রত্যক্ষকে ছেড়ে, পরোক্ষের পিছনে ধাবমান হওয়াকে মূর্খতা বলেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে পরম পদ হচ্ছে মনের একটা অবস্থা। মনের শঙ্কাযুক্ত স্থিতি ছুটে গেলে তার চঞ্চলতা বিনষ্ট হয় এবং পরম মহাসুখের স্থিতি আসে। পরমপদ হচ্ছে পরম মহাসুখ যা আদি অন্ত মধ্য রহিত। এই পরম পদকে সংসারও বলা যায় না নির্বাণও বলা যায় না। এর মধ্যে আপন-পরের ভেদ নেই। অগ্র পশ্চাতকে এবং দশদিকে যে দিকেই দেখা যাক না কেন সহজ সাধক পরম পদকে প্রত্যক্ষ করবেন। পরমপদকে সরহপা শূন্য নিরঞ্জন বলেছেন। এই শূন্যবাদ সরহপা-র সহজ সাধনার একটি ব্যাখ্যা। উপনিষদ-এ নিরঞ্জন হচ্ছে ব্রহ্মা। সরহপা ব্রহ্মাবাদী ছিলেন না তাই তাঁর নিবন্ধন হচ্ছে শূন্য নিবন্ধন। শঙ্কর বেদান্ত কর্তৃক প্রতিপাদিত মোক্ষ এবং সরহপার সহজ সাধনা এক নয়। সরহপার সাধন ধারার মধ্যে চুরাশি জন সিদ্ধ এসেছিলেন। অন্তিম সিদ্ধ ছিলেন কালোপা এবং কঠালিপা। এরা একাদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে জীবিত ছিলেন।

পারিভাষিক শব্দ

অবধূতী - যোগিনী, সুষুম্ননা।
এবংকার - শূন্যতা- করুণাভিন্ন মোহমুদ্রা।
করী - চিত্ত, চিত্ত-গজেন্দ্র।
করুণা - দয়া।
কুন্দুরু - ইন্দ্রিয়সমাপত্তি, মৈথুন।
গিরি - পর্বত, নিতম্ব।
গৃহিণী - পত্নী, মহামুদ্রা, দিব্যমুদ্রা, জ্ঞানমুদ্রা।
তরুণী - মহামুদ্রা।
নিরঞ্জন - নির্মল, সহজকায়।
পদ্ম - ভগ, কমল।
বোধিচিত্ত - শুক্র, বোধিমন।
রবি - রজ, পিঙ্গলা
রসনা - জিহ্বা, কমল।
ললনা - স্ত্রী, ঈড়া।
বজ্র - শূন্যতা
বজ্রধর - কায়বাক্‌চিত্ত, স্বামী।
বজ্রযান - মন্ত্রযান।
বিন্দু - পুরুষ, অনাহত, বজ্রধর।
শশী - শুক্র, চন্দ্র, ঈড়া, পিঙ্গলা।
সমরস - চিত্ত নিরোধ, মৈথুন।
সূর্য - রজ, পিঙ্গলা, দক্ষিণ নাসাপুট।
হুংকার - বজ্রধর।